بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ইলেকট্রনিক গেমস এবং কমার্সিয়াল সেন্টারের মহামারি

ইলেকট্রনিক গেমস এবং কমার্সিয়াল সেন্টারের মহামারি

মূল

শাইখ সালেহ আল মুনাজ্জিদ

অনুবাদ

শেইখ আসিফ

আশিক আরমান নিলয়

পরিমার্জন এবং সম্পাদনা

সাজিদ ইসলাম

শর'ঈ সম্পাদনা

মাওলানা আবদুল্লাহ আল মাসউদ

সীরাত পাবলিকেশন

সেই হতভাগা পরিবারগুলো

যেখানে পুরুষেরা ভিডিও গেমস খেলে সময় পার করছে, বাড়ির
মেয়েরা অনর্থক শপিং মল আর মার্কেটে মার্কেটে ঘুরে বেড়াচ্ছে।
এই বইটা তোমাদের হৃদয়ে হেদায়াতের নূর হয়ে আসুক।

সূচী

আমাদের কথা

আধুনিকতার ছোঁয়ায় আমরা যেমন জীবন উপভোগের নানান উপকরণ সহজেই পাচ্ছি, তেমনি তার জন্য আমাদের খেসারতও কম দিতে হচ্ছে না। মহামারি আকারে আমাদের সন্তানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও গেমসের নেশা আর অক্টোপাসের মতো ঘিরেধরা চারপাশের কমার্শিয়াল সেন্টার, শপিং মল, কমপ্লেক্সের ফিতনা-সমস্যাও আমাদের কম পোহাতে হচ্ছে না। কিন্তু আমরা কি অনুধাবন করতে পেরেছি সেই সমস্যা কতটা ভয়াবহ?

সত্যি বলতে কি, এই বইয়ের কাজ হাতে না নিলে আমি নিজেও সেটা বুঝতে পারতাম না। বিশেষ করে ভিডিও গেমসের সমস্যা তো ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ভিডিও গেমসকে উপজীব্য করে যেভাবে আমাদের সন্তানদের মধ্যে ইসলামবিদ্বেষ, ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস আর দ্বীন বিনষ্টকারী নানান চিন্তা-চেতনা ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার সত্যিকারের চিত্র বইতে ফুটে উঠেছে; যা সত্যিই ভয়াবহ। অন্যদিকে শপিংমল, মার্কেটের আধিপত্য এবং আমাদের প্রজন্ম শপিং ম্যানিয়াক হয়ে ওঠা কীভাবে আমাদের দাম্পত্য জীবন এবং সামাজিক পরিবেশকে দূষিত করছে তারও একটা ভয়াবহ চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে। সেই সাথে ইসলামের আলোকে দুটো বিষয়কে চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন শাইখ সালেহ আল মুনাজ্জিদ।

আমাদের এই বইটি মূলত শাইখের দুটি পুস্তিকার একীভূত রূপ। The Epidemic of Electronic Games এবং The Rise of Commercial Centers: Problems and Solutions থেকে অনূদিত হয়েই বাংলায় রূপ নিয়েছে ইলেকট্রনিক গেমস এবং কমার্সিয়াল সেন্টারের মহামারি। দুজন অনুবাদক ছোটভাই শেইখ আসিফ এবং আশিকুর রহমান নিলয়ের ইংরেজি থেকে অনুবাদ শেষে সম্পাদনার কাজ হয়েছে কিছুটা। এরপর উস্তাদ আবদুল্লাহ আল মাসউদ এই মূল্যবান কাজের বাংলা সংস্করণটির শর'ঈ সম্পাদনা করেছেন।

সমাজের সমস্যাগুলো টার্গেট করা এবং সেটার সমাধানে ইসলামকে উপস্থাপন করার চেষ্টা থেকেই এই বইয়ের কাজ করা। ইসলাম বিনষ্টকারী যেকোনো কিছু থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ-প্রজন্ম, আমাদের পরিবারকে রক্ষা করা আমাদের ওপর এক মহান দায়িত্ব। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আজ আমরা সেই দায়িত্বপালনে

অবহেলা তো করছিই, স্রোতের সাগরে ভেসে যাওয়া আমাদের প্রজন্মকে তুলে আনার জন্যও তেমন কোনো পদক্ষেপ আমাদের নেই। আমরা আমাদের রবের কাছে আন্তরিকভাবে চাই, আল্লাহ্ এই বইটি যেন বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের উপকারে আসে। ঈমান বিনষ্টকারী ফিতনা থেকে আমাদের পরিবার, আমাদের সমাজ, আমাদের সন্তানরা যেন হেফাজতে থাকে। আমীন।

বিনীত
সাজিদ ইসলাম
সম্পাদক, সীরাত পাবলিকেশন

ইলেকট্রনিক গেমসের মহামারি

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর। তিনি কুর'আনে আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন :

> **"আর দুনিয়ার জীবন খেলতামাশা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। আর আল্লাহকে ভয়কারীদের জন্য তো আখিরাতের আবাসই উত্তম। অতএব তোমরা কি বুঝবে না?[১]**

দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সেই মহামানবের প্রতি, যিনি এসেছিলেন সকল সৃষ্টির জন্যে রহমতস্বরূপ। শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পূণ্যাত্মা পরিবার, সাহাবায়ে কেরাম, তাঁর সম্মানিতা স্ত্রীগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের রেখে যাওয়া পথের সকল অনুসারীর প্রতি।

শুরুর কথা

দ্বীনের যে বিষয়গুলোতে খুব বেশি জোর দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে একটি হলো—মহান আল্লাহর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা। এবং সরব কণ্ঠে জানিয়ে দেওয়া যে, তিনি মূর্খদের আরোপিত সীমাবদ্ধতার অনেক ঊর্ধ্বে । এ ছাড়াও তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক অথবা তাওহীদের জন্য অপমানজনক যেকোনো বিষয় থেকে তাওহীদের সম্মান রক্ষা করাও দ্বীনের এক মহান দায়িত্ব। একই সাথে ইসলামের প্রতিটি বিধিবিধান এবং দ্বীনের পবিত্রতা সমুন্নত রাখার বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবারের পিতা, চিন্তাশীল ব্যক্তি, দ্বীনের দাঈ—সমাজের এই দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের উপর অর্পিত একটি মহান দায়িত্ব হলো নতুন প্রজন্মকে বিশুদ্ধ তাওহীদের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। সেই সাথে তাদের কুফর ও শিরকি বিশ্বাস থেকে দূরে রাখা, যাদের মাঝে এ সকল বিশ্বাসের চর্চা হয় তাদের সাথে মেলামেশা বন্ধ করা, এমনকি যে সকল বস্তু কুফর-শিরকের পরিচয় বহন করে সেসব কিছু থেকে অধীনস্থদের হেফাজত করা দায়িত্বশীলদের উপর আরোপিত শরয়ী দায়িত্ব।

এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তাদের এমনভাবে বড় করে তোলা যাতে তারা শরিয়তের প্রতিটি বিধিবিধানকে ভালোবাসে, সেগুলোর পবিত্রতার ঘোষণা করে এবং দ্বীন পালনে একনিষ্ঠভাবে লেগে থাকে।

দায়িত্বশীলদের যেমন নিজেদের অনৈতিক আচরণ এবং কাজকর্ম থেকে বিরত রাখতে হবে, সেই সাথে তাদের অধীনস্থদেরও ওই সমস্ত কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে যা গুনাহের পথে পা বাড়াতে উৎসাহিত করে।

---

[১] সূরাহ আনআম, ৬ : ৩২

বর্তমান সময়ে প্রচারমাধ্যম আমাদের মধ্যে নানা অপবিশ্বাস আর বাতিল মতবাদ ঢুকিয়ে দিয়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে ভিডিও গেইমস। একটু সময় লাগলেও ভিডিও গেইমস ইতোমধ্যেই সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গিয়েছে। যুবকরা তো বটেই এমনকি কালেভদ্রে বয়স্ক লোকেরাও ক্রমাগত এতে আসক্ত হয়ে পড়ছে। কায়েমি স্বার্থবাদী পাশ্চাত্যের অবিশ্বাসী সম্প্রদায় এবং প্রাচ্যের পৌত্তলিক মুশরিকরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে একযোগে ষড়যন্ত্র করতে কার্পণ্য করেনি। আবহমানকাল ধরে তারা মুসলিমদের সাথে যে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ চালিয়ে আসছে ভিডিও গেইমস তার একটা হাতিয়ার। এর মাধ্যমে তারা তাদের ইচ্ছেমতো নিজেদের জঘন্য আদর্শের প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। তারা এইসব প্রচার-প্রচারণা দ্বারা মোটাদাগে দুটি স্বার্থ হাসিল করতে চায়। প্রথমত, সমাজের অধিকাংশ লোকের মাঝে তাদের চিন্তাচেতনার প্রচার ও প্রসার ঘটানো। দ্বিতীয়ত, অশ্লীল কিংবা নিরেট যৌন আবেদনময় পণ্য তৈরি করে তা দিয়ে নগদ অর্থ আয়। লোকেদের চালচলন বা আকিদা-বিশ্বাস উচ্ছন্নে যায় যাক, এটা তাদের মাথাব্যথার বিষয় নয়।

সামগ্রিক ফলাফল বিচারে দেখা যায় যুবসমাজের উপর এর নেতিবাচক প্রভাবে তারতম্য থাকে। কারও ক্ষেত্রে এর প্রভাব খুব বেশিই খারাপ আবার কারও ক্ষেত্রে কিছুটা কম। এটা নির্ভর করে কে দ্বীন থেকে কতটা বিচ্যুত, কে কত তাড়াতাড়ি বাজে জিনিস দ্বারা প্রভাবিত হয় কিংবা একজন মানুষ গেইমস খেলে কতক্ষণ সময় পার করছে এসবের উপর। মাঝেমধ্যে গেইমসের গ্রাফিকাল সৌন্দর্য, কাহিনি, যে খেলছে তার বয়স কিংবা সে জিনিসটাকে কীভাবে নিচ্ছে এসবের উপরও নেতিবাচক প্রভাবের মাত্রা নির্ভর করে।

গবেষক কিংবা শিক্ষাবিদেরা বরাবরই আমাদের ইলেকট্রনিক গেমসের নেতিবাচক প্রভাবের বিরুদ্ধে সতর্ক করে আসছেন। বর্তমান যুগে আমাদের সন্তানদের উপর এর বিরূপ প্রভাব যে মহামারি আকার ধারণ করেছে এটাও তারা ইতোমধ্যেই আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন।

ভিডিও গেইমসের দৌরাত্ম্য এতদূর বেড়েছে যে দোকানে এসব কিনতে গিয়ে ক্রেতা নিজেই ভাবতে বসে যায় কোনটা রেখে কোনটা কিনবে! লম্বা এক লিস্ট প্রস্তুত থাকে তার সামনে।

এই পুরো বইতেই আমরা গবেষক এবং শিক্ষাবিদদের সাথে একই সুরেই কথা বলেছি। সম্মানিত অভিভাবক এবং পিতামাতার সামনে এই ভিডিও গেইমস যে কতটা বিপজ্জনক সেটা তুলে ধরেছি। ইসলামের আকিদা-বিশ্বাস এবং বিধিবিধানের সাথে এর বিরোধটা কোথায় এবং কীভাবে গেইমগুলো

তরুণসমাজের হৃদয়ে অবিশ্বাসের বীজ বুনে দিচ্ছে তার একটা চিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।

তা ছাড়া ভিডিও গেইমসের আরও যেসব ক্ষতিকর দিক থাকতে পারে সেসব নিয়েও আমরা কথা বলব। এসব গেইমসের বিভিন্ন ধরন ও প্রকার সম্পর্কে জানার পর আমরা দেখব এসবের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার কীভাবে আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করছে। শেষ দিকে এসবের সম্বন্ধে ইসলামী শরিয়তের অবস্থানটাও জেনে নেব।

আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে সাহায্য চাই তিনি যেন আমাদের সরল সঠিক পথের দিশা দেখিয়ে দেন।

ভিডিও গেইমস নিয়ে কেন বলতে গেলাম?

কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সত্য এবং মিথ্যার লড়াই চলতে থাকবে। উভয় দলই নিজের সর্বস্ব ঢেলে দিতে চাইবে এ লড়াইয়ে। বাতিলের ঝান্ডাধারী লোকজনের সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। আজ তাদের পরিকল্পনা তাদের সৈনিক, সমরকৌশল আর নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই; বরং নানাদিক থেকে মুসলিম সমাজকে আক্রান্ত করতে চাইছে । বর্তমান যুগের যুদ্ধটা সেই প্রচলিত ধারার কোনো যুদ্ধ নয়; বরং নয়া উদ্ভাবিত এই যুদ্ধে তারা নষ্টামির আশ্রয় নিয়েছে। আবার সেই নষ্টামিকে তারা আমাদের সামনে খুব আকর্ষণীয় সাজে উপস্থাপন করছে।

গল্পের শুরু মুভি, অপেরা সোপ কিংবা মুভি স্টারদের জনপ্রিয়তা বাড়ার মধ্য দিয়ে। রুপালি পর্দার তারকারা আজ কমবয়সী ছেলেমেয়েদের মাথা খেয়ে ফেলছে। অবস্থা এতটাই বেগতিক যে, আমাদের ছেলেমেয়েরা এখন এদের মতো মানুষদের নিজেদের রোল মডেল ভাবে।

কমবয়সী ছেলেপুলে খুব নিয়ম করে এসব তারকাদের ফলো করে। পত্রিকায় তাদের নিয়ে রিপোর্ট পড়া, তাদের দৈনন্দিন হাল-হাকিকতের খোঁজ রাখা কিংবা সাম্প্রতিক তারকা-আলাপগুলোর খবরাখবর এরা ভালোই রাখে। নতুন নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আসছে নতুন আঙ্গিকের গণমাধ্যম। এইসব দিয়ে তারা মুসলিম সমাজের উপর শক্ত আঘাত হানছে । এ আক্রমণ মুসলিমদের আকিদা-বিশ্বাসের শিকড় উত্তোলনের আক্রমণ। এ আক্রমণকারীরা আরও চায় মুসলিম সমাজকে তার প্রকৃত বোধবুদ্ধির আলো থেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞতায় নিয়ে যেতে এবং এ সমাজকে বহুমুখী সংস্কৃতির এক জগাখিচুড়ি বানাতে। এর উদ্দেশ্য মুসলিমদের একটি

শিকড়কাটা ছিন্নমূল সম্প্রদায়ে পরিণত করা। যাদের কাছে স্বতন্ত্র কোনো সংস্কৃতি থাকবে না, যাদের থাকবে না কোনো পরিচয় এবং সাথে নিয়ে চলার মতো কোনো আদর্শ।

ভাবনার বিষয় হলো এ আক্রমণের মূল টার্গেট হচ্ছে কমবয়সী ছেলেমেয়ে। এই তারুণ্যই আমাদের সুন্দর এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ধারক-বাহক। এরাই আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার মুকুল। তবে এ প্রজন্মের সমস্যা হলো তারা নতুন কোনো বিষয়ে অল্পতেই ঝুঁকে পড়ে। বিষবাষ্পময় পরিবেশে বেড়ে ওঠা এই নাজুক তরুণেরা তো আমাদেরই সন্তান এবং আমাদের রক্ত তো তাদের মাধ্যমেই যুগ যুগ ধরে বয়ে যাবে। কিন্তু যখনই তারা কৈশোর থেকে তারুণ্যের সন্ধিলগ্নে পৌঁছে তখন যদি এসব বিজাতীয় ও ক্ষতিকর বিষয়গুলো তাদের মন-মস্তিষ্কে ঢুকে পড়ে, তাহলে এটা তাদের আচার-আচরণেও প্রভাব ফেলতে পারে।

কাফের-মুশরিকরা মুসলিম সমাজে যে ভয়ানক আক্রমণ পরিচালনা করছে সেখানে তাদের অন্যতম সৈনিক হলো কম্পিউটার এবং ভিডিও গেইমস। এই যন্ত্রগুলো ইতোমধ্যেই আমাদের তরুণ ছেলেমেয়েদের মন-মস্তিষ্কের উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে। নতুন এবং অজানা সব প্রথা ও সংস্কৃতির সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। এর চেয়েও আতঙ্কের বিষয় হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ইসলামবিরোধী আকিদা-বিশ্বাসেরও অনুপ্রবেশ ঘটছে।

তবে একটা বিষয় জানা থাকা দরকার, মুসলিমদের শিকার বানানোই কিন্তু সব ভিডিও গেইমসের মূল উদ্দেশ্য ছিল না। অনেকের উদ্দেশ্য ছিল শুধুই টাকা কামানো কিংবা তাদের ধ্যান-ধারণার প্রচার-প্রসার ঘটানো। কিন্তু শেষমেষ এটা ঠিকই মুসলিম তরুণদের প্রভাবিত করেছে এবং অভিভাবকদের অগোচরেই তাদের এ আদর্শিক যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

তরুণদের কাছে কম্পিউটার, ভিডিও গেইমস এবং বিশেষ করে প্লে-স্টেশন আজকাল খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অবস্থা এতটাই নাজুক যে আমাদের সন্তানেরা এবং তরুণসম্প্রদায় প্লে-স্টেশন ছাড়া থাকার কথা কল্পনাই করতে পারে না।

এসব ভিডিও গেইমসের অনুপ্রবেশ শুধু যে আমাদের পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সাথেই পরিচিত করে তুলছে এমনটি নয়। বরং প্রাচ্যের কুফরি সংস্কৃতির সাথেও আমাদের পরিচিত করে তুলছে। অর্থাৎ এসব ভিডিও গেইমস অবিশ্বাসীদের নাস্তিকতা কিংবা পৌত্তলিকতার মিশ্রণে একটা শরবত বানিয়েছে। এই শরবতে আছে কুফর এবং পাপাচারের এক নতুন আমেজ।

কয়েক বছর যাবৎ কিশোর কিংবা তরুণদের মধ্যে ভিডিও গেইমস যে বাজে প্রভাব ফেলছে তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট । দ্বীন এবং দ্বীনের বিধিবিধানের প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য কিংবা দ্বীনের প্রকৃত বুঝ এই প্রত্যেকটি জিনিসই এইসব গেইমস দ্বারা আক্রান্ত। তা ছাড়া এসবে ব্যস্ত থাকায় স্বাস্থ্য আর সময়ের যে ক্ষতি হয় তার কথা তো না বললেই নয়। স্নায়বিক দিক থেকেও ভিডিও গেইমস ব্যবহারকারী ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

অনেক সময়ই সন্তানদের আমরা এমন সব জিনিস দিয়ে ব্যস্ত রাখি যা আমাদের কাছে শুধুই তাদের সময় কাটানোর একটা মাধ্যম। কিন্তু আমাদের অজান্তে সেগুলো যে তাদের কতটা ক্ষতি করতে পারে তা আমাদের জানা নেই। আমাদের সন্তানদের মাঝে যে অস্বাভাবিক ব্যবহার কিংবা স্বাস্থ্যগত অস্বাভাবিকতা আমরা দেখি তার ব্যাপারে বলাই বাহুল্য। ক্লাসরুমে কিছু বাচ্চার পড়াশোনার বেহাল অবস্থার কথাটাও চিন্তা করা যায়। আমরা একটা বাচ্চাকে নিয়ে আর কী আশা করতে পারি, যে কিনা

> “বাড়িতে ছোট এক রুমের কোনায় বসে চোখগুলোকে ছোট কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে আটকে রাখে? উজ্জ্বল বাহারি রঙের আলোঝলমল স্ক্রিনটা জ্বলজ্বল করতে থাকে তার চোখের সামনে। তার হাতে ছোট একটা কন্ট্রোলার যা সারাক্ষণ তার হাতের স্পর্শে থাকে। কন্ট্রোলার নড়লে হাতও নড়ে। দেখবেন মাঝেমধ্যে তার মাথায় রাগও চড়ে যায়। উন্মাদের মতো সে কন্ট্রোলারের বাহারি রঙের বোতামগুলো চাপতে থাকে। তাদের কানগুলো এতটাই সজাগ থাকে যে প্রত্যেকটি শব্দ, চিৎকার কিংবা বিট তারা শুনতে পায়। এই শব্দগুলো আবার বাহারি গোছের। কখনো উঁচু স্বরের কখনো-বা নিচু। এগুলো খুব সহজেই সামনের ব্যক্তিকে মুগ্ধ করে রাখে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। যে খেলছে সে টেরই পায় না আশেপাশে কী হচ্ছে না হচ্ছে।”[২]

এইসব গেইমস নিয়ে কথা বলতে চাইলে কিংবা যেসব চিন্তাচেতনার প্রচার তারা ঘটাতে চায় সেগুলো অল্পকথায় জানতে হলে নিচের তথ্যগুলো কাজে আসবে :

১) এগুলো খুব দ্রুত সবখানে এমনকি আমাদের বাসাবাড়িতেও ছড়িয়ে পড়েছে।

---

[২] *আল আল’আব আল আলাকট্রনিয়া ওয়া ওয়াক্বিউ আতফালিনা*- ইসমাইল আবু যা’নাযাহ, আশ-শাক্বা’ইক্ব, ৬১ তম সংস্করণ, রজব ১৪২৩ হিজরি/সেপ্টেম্বর, ২০০২ সাল, পৃষ্ঠা : ২৯

সৌদি আরবের এক ভিডিও গেইমস পরিবেশক সংস্থা জানান যে, সৌদি আরবের বাজারে ভিডিও গেইমসের মহামারি দেখা গিয়েছে। তাদের মতে প্রায় ১৮,০০,০০০ বাড়িতে প্লে-স্টেশন বক্স আছে। এর মানে দাঁড়ায় সৌদি আরবে ৪০% এর বেশি বাড়িতে অন্তত একটা করে প্লে-স্টেশন বক্স আছে। আর এটা দিয়ে অন্যান্য ইসলামিক দেশের অবস্থাও কিছুটা আঁচ করা যায়।[৩]

২) অনেক শিক্ষাবিদই এসব গেইমসের মাধ্যমে সৃষ্ট সমস্যা এবং এর নানাবিধ ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে সতর্ক হচ্ছেন, অন্যদের সতর্ক করার চেষ্টা করছেন।

৩) বর্তমান প্রজন্মের একটা সাধারণ সমস্যা হলো তাদের দ্বীনি জ্ঞানে ঘাটতি এবং চারিপাশের সম্ভাব্য বিপদ সম্বন্ধে বেখেয়ালিপনা।

৪) লোকজন ভিডিও গেইমসে এতটাই মজে গিয়েছে যে, এর ক্ষতি থেকে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে খুব বেগ পেতে হয়।

৫) এই সমস্ত গেইমসের ব্যবহারকারীদের অনেকে এতটাই গেইমে আসক্ত যে, এটা তাদের দ্বীনি কিংবা দুনিয়াবি সব কাজেই ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

৬) আপাতদৃষ্টিতে এইসব গেইমস দ্বারা কিছু লাভ হয়ে থাকে। যেমন : বাচ্চাকাচ্চা রাস্তাঘাটে কোনো ঝামেলায় জড়ানো থেকে বিরত রাখে কিংবা এগুলো খেলায় ঘরে চিৎকার-চেচামেচি খুব একটা হয় না। এইসব কারণে অনেক অভিভাবক ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকেন। অথচ তারা জানেন না, এই ছোট্ট একটা লাভের জন্য তাদের অজান্তেই সন্তানদের দ্বীন,আচার-আচরণের কী পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হচ্ছে।

৭) এই গেইমসগুলো খুবই বিভ্রান্তিকর। এর খারাপ উপাদানগুলো মন্দের ভালো উপাদানগুলোর সাথে এমনভাবে জড়িত যে উভয়কে আলাদা করে ক্ষতিকর দিক সম্বন্ধে সতর্ক থাকা খুবই কঠিন কাজ।

এইসব গেইমস নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে আমরা বের করেছি কেন তরুণ ছেলেমেয়েরা এসবের দিকে ঝুঁকছে। অনেকগুলো কারণের মধ্যে কয়েকটি হলো :

১) চমৎকার গ্রাফিক্স : এই গ্রাফিক্সের পেছনে কাজ করে বিশাল অঙ্কের বাজেট। গেমিং কোম্পানিগুলো প্রচুর টাকা ঢেলে এই জায়গায় বাঘা বাঘা লোকদের নিয়োগ করে। এ ছাড়া মার্কেটিং-এ ঝানু লোকজনকে নিয়োগ দেয় যারা

---

[৩] *আত তিফল আল মুতামায়্যিযাহ*, ২৩তম সংস্করণ, যিলক্বদ, ১৪২৫ হিজরি

মার্কেট যাচাই করে দেখে ভোক্তারা কেমন গেইমস চাচ্ছে। ভিডিও গেইমসগুলোর উত্তরোত্তর উন্নতি এবং আপডেটের জন্য কোম্পানিগুলো প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে।

২) চরম উত্তেজনাকর : গেইমের প্রতিটি বিষয় যেমন ড্রয়িং কেমন হবে, কোন কালার কোন জায়গায় যাবে কিংবা গেইমের এডভেঞ্চার বা রোমান্স সবগুলোতেই ব্যাপক কাজ করা হয়। মানুষের কল্পনার জগৎ যেখানে ডানা মেলে সেসব মজার মজার বিষয় দিয়ে সাজানো হয় গেইমের বিষয়গুলো। তা ছাড়া নিখুঁত গ্রাফিক্স এবং এনিমেশনের নিপুণতা এসব গেইমসে যোগ করে নতুন মাত্রা।

৩) প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় : এটা গেইমসের মূল আকর্ষণ। যেমন : মোটর রেসের কথাই ধরুন। এসব প্রতিযোগিতায় কে কাকে পেছনে ফেলবে তা মাথায় ঢুকে যায়। কোনো কোনো গেইমে আবার একজন নায়ক চরিত্র থাকে যে কিনা মানুষকে দুষ্ট লোকদের হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছে। আবার এমন গেইমও আছে যেখানে একজন ক্রিমিনাল পুলিশের কাছ থেকে পালাতে চাচ্ছে বা জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া কোনো হিংস্র পশুপাখির সাথে মারামারি করছে। ফলে খেলোয়াড় সব সময় একটা প্রতিযোগিতার মানসিকতায় থাকে এবং গেইমসের কাহিনির মধ্যে পুরোপুরি ঢুকে যায়।

৪) বাস্তবের আমেজ : গেইমসের বিভিন্ন জায়গায় ছবিগুলোকে খুব নিখুঁতভাবে সাজানো হয়। যেন তা পুরোটাই বাস্তব। ফলে যে খেলছে সে মনে করে সে আসলেই যেন এ কাজগুলো করছে। সে নিজেকে কখনো আবিষ্কার করে জঙ্গলে, কখনো পর্বতে এভাবে নানা জায়গায়। এই ভিডিও গেইমস মানুষকে তার প্রকৃত বাস্তবতা থেকে এক ভার্চুয়াল বাস্তবতার দিকে নিয়ে যায়, আদতে যার কোনোই অস্তিত্ব নেই। এমনকি এই ভার্চুয়াল জগৎ তার মন-মস্তিষ্ককে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, তার আশেপাশে কী হচ্ছে এ ব্যাপারে তার কোনো মাথাব্যথাই থাকে না।

৫) মূল চরিত্র : গেইমগুলো মূল চরিত্রকে অর্থাৎ নায়ককে অনেকটা গল্পের আকারে উপস্থাপন করে। একজন খেলোয়াড় খেলা চলাকালীন এই চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে। ফলে সে ওই চরিত্রের সাথে অনেকটাই মিশে যায়। এমনকি খেলা শেষেও এর একটা হালকা প্রভাব তার মাঝে থেকে যায়। এইসব চরিত্র তার মাঝে একটা নায়ক নায়ক ভাব এনে দেয়। অনেক সময় সে নিজেকে অন্যদের চেয়ে শক্তিশালী ভেবে বসে। কখনো আবার এগুলো খেলোয়াড়কে হাসায় বা মজা

দেয়। এই সব কারণে যে সব সময় ভিডিও গেইমস খেলে সে সহজে এই মজা ছাড়তে চায় না।

চিন্তাচেতনার উপর ভিডিও গেইমসের প্রভাব

মহান আল্লাহ ইসলামকে সবদিক বিবেচনায় একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে পাঠিয়েছেন। এর প্রতিটি বিধিবিধানকে তিনি জীবনের প্রতিটি ধাপের দিকনির্দেশনাস্বরূপ তৈরি করেছেন। জীবনের সাথে সম্পর্কিত এমন কোনো কথা বা কাজ নেই যার উপর ইসলামের দিকনির্দেশনা নেই।

ভিডিও গেইমসগুলো তাই ইসলামের নিরিখে যাচাই করা জরুরি। এটাই তো স্বাভাবিক যে, দ্বীন সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তিমাত্রই চাইবেন জীবনের প্রতিটি বিষয়ে তার আদর্শের প্রতিফলন ঘটাতে। যেহেতু এই ভিডিও গেইমসগুলো নাস্তিকতা কিংবা কুফরের পরিবেশ থেকে উঠে এসেছে তাই এগুলোর মধ্যে প্রচুর পরিমাণ ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক কিংবা অপছন্দনীয় জিনিস আছে। কখনো কখনো অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে, এই গেইমসগুলোর বিষয়বস্তু ইসলামের সাথে চূড়ান্ত শত্রুতার শামিল।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের হৃদয়ে ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তাদের হৃদয়ে ঈমানকে সাজিয়েছেন সুন্দর সাজে। একই সাথে কুফর, পাপ কিংবা অবাধ্যতার বিষয়গুলোকে অপছন্দনীয় করেছেন এবং তাঁর বান্দাদের সরল সঠিক পথটি দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এই ভিডিও গেইমসের ভেতর অনেকগুলোই আল্লাহর পছন্দনীয় জিনিসের ঠিক উল্টোটা করতে উৎসাহিত করে।

এই ভিডিও গেইমসগুলো অনেক দিক থেকেই ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। ইসলামবিরোধী গোমরাহী আদর্শের প্রচার-প্রসারেও নানাভাবে এগুলো সাহায্য করে যাচ্ছে।

আমরা এই সাংঘর্ষিকতাকে ৩ ভাগে ভাগ করব। ইসলামী বিশ্বাসের বিকৃতিসাধন, ইসলামের সৌন্দর্য নষ্ট করা এবং আচার-আচরণের ক্ষতিসাধন।

প্রথম সমস্যা : সঠিক ইসলামী আকিদার বিকৃতি ঘটানো

ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত দুইভাবেই অনেক ভিডিও গেইমস আমাদের সন্তানদের আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসের বিষয়টিতে আঘাত হানে। এগুলো

তাওহীদের সম্পূর্ণ বিপরীত বোধ-বিশ্বাস তাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। এই ধরনের গেইমস অবশ্য সংখ্যায় অল্প। তবে এই অল্পসংখ্যক গেইমসগুলোই একজন ব্যক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ তাওহীদ থেকে তাকে বিচ্যুত করে ফেলে।

এই ধরনের কিছু গেইমসের ক্ষতিকর দিকের মধ্যে রয়েছে :

প্রথমত : মহান আল্লাহকে নানাভাবে ছোট করার অপচেষ্টা

দ্বীনের অবমাননা মেনে নিতে পারে না এমন একজন ব্যক্তি একটা ভিডিও গেইম দেখে অনেকটা এমন অভিব্যক্তি দিয়েছেন :

> "কিছু জিনিস দেখে সত্যিই আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। এমনকি আমার মনে হচ্ছিল মাটি দুইভাগ হয়ে আমাকে গিলে ফেলবে। একটা ভিডিও গেইমসের দোকানে বিজ্ঞাপনের পর্দায় ওই কুৎসিত জিনিসটা দেখেছিলাম। সেখানে একটা দেবতার ছবি দেখানো হচ্ছিল যা কিনা পাখির রূপ ধরে উপর থেকে অবতরণ করছিল। এরপর গেইমের নায়কের সাথে কিছুক্ষণ তার মারামারি হলো। এরপর পাখিটা উপরের দিকে পালাতে লাগল। আর সেই মুহূর্তে নায়ক ওটার দিকে দোযখের আগুন নিয়ে ছুড়তে লাগল। এরপর নায়ক একটা উড়ালপঙ্খি ঘোড়া নিয়ে সেই প্রতীকী দেবতার পেছনে ছুটল।"

কিছু গেইমসে অবস্থা তো এতদূর গড়িয়েছে যে, তারা দেখায় আল্লাহর প্রতিনিধি পৃথিবীতে এসে অনৈতিক এবং বাজে সব কাজ করে বেড়াচ্ছে। রক্তপিপাসু শয়তানি চরিত্র হিসেবে এদের দেখানো হচ্ছে। অথচ মহান আল্লাহ এসব থেকে পবিত্র।

আল্লাহকে অসম্মান করার আরেকটি দিক হচ্ছে এসব গেইমসগুলো প্রাচীন পৌত্তলিক সভ্যতা, যেমন গ্রিক সভ্যতার কাহিনিগুলো তুলে আনে। এখানে দেখানো হয় এ বিশ্বে বহু দেবতা রয়েছে এবং তাদের মধ্যে হানাহানি মারামারি লেগেই থাকে। এটাও দেখানো হয় যে ক্ষেত্রবিশেষে এ সমস্ত দেবতারা অসুস্থ হয়ে তাদের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে কিংবা অলৌকিকভাবে এসব ক্ষমতা আবার ফিরেও পায়। নারী দেবীদের বর্ণনাও এখানে থাকে।

যেমন একটা গেইমে দেখানো হয়েছে একজন নারী দেবী মহান ঈশ্বরকে বলছেন, "আমিই শক্তি দানকারী, তাই আমার কথা শোনো এবং আমিই তোমাকে বলে দেবো কীভাবে অন্য দেবতাদের মারতে হয়।"

মহামহিম আল্লাহ বলেন,

> **“যদি আসমান ও জমিনে আল্লাহ ছাড়া বহু ইলাহ থাকত তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত, সুতরাং তারা যা বলে, আরশের রব আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।[৪]**

এ কেমন আজব ঈশ্বর যাকে কিনা অন্যদের এসে নানা জিনিস শিখিয়ে যেতে হয়। এ কেমন আজব দেবতা যে, তাদের অন্যরা এসে শক্তি-সামর্থ্য দান করে যায়? এ কেমন আজব ঈশ্বর যে অন্যের মুখাপেক্ষী, অন্যদের ছাড়া প্রতিশোধ নিতে পারে না এবং অন্যের কাছে সাহায্য চায়?

আল্লাহ তা’আলা বলেন,

> **“বলো, ‘তাঁর সাথে যদি আরও উপাস্য থাকত, যেমন তারা বলে, তবে তারা আরশের অধিপতি পর্যন্ত পৌঁছার পথ তালাশ করত।’ তিনি পবিত্র মহান এবং তারা যা বলে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে। সাত আসমান ও জমিন এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছু তাঁর তাসবীহ পাঠ করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করে না; কিন্তু তাদের তাসবীহ তোমরা বোঝো না। নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।”[৫]**

দ্বিতীয়ত : শিরক এবং কুফরের বিষয়গুলোকে নতুন এবং আকর্ষণীয় মোড়কে উপস্থাপন

বিভিন্নভাবে এটা করা হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহর ছাড়া অন্য কোনো দেবতাকে সর্বশক্তিমান দেখানো হয়। এরা এমন শক্তিধর যে, কেউ তাদের পরাজিত করতে পারে না। অথবা কিছু কিছু নায়ককে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যে, তাদের কোনোভাবেই হত্যা করা বা মেরে ফেলা যায় না। অনেক সময় জগতের নিরাপত্তা কেবল এই নায়কের উপরই নির্ভর করে। এ নায়ক নানা ধরনের অতিমানবীয় ঐশ্বরিক কাজকর্ম করে যা কোনোভাবেই কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব না।

আমরা আমাদের সন্তানদের খাঁটি তাওহীদের উপর বড় করার পরিবর্তে বিভিন্ন ফাঁদে ফেলছি নিজেদের অজান্তেই। আল্লাহ কুর’আনে বলেন,

> **“বলো, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম**

[৪] সূরাহ আম্বিয়া, ২১ : ২২

[৫] সূরাহ বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৪২-৪৪

দেওয়া হয়নি। আর তাঁর কোনো সমকক্ষও নেই।”[৬]

কিন্তু আমরা উল্টো তাদের সামনে এমন সব বিষয় উপস্থাপন করছি যা কিনা শিরকি আকিদা-বিশ্বাস সম্বন্ধে ইতিবাচক ধারণার প্রসার ঘটায়। চিন্তা করে দেখুন তো, তাওহীদের সুশীতল ঝরনায় সিক্ত হবার পর আমাদের অবহেলায় কি সন্তানেরা এসব শিরকি আকিদা-বিশ্বাস শিখে বড় হবে?

মহামহিম আল্লাহ বলেন,

“বলো, ‘আমরা কি ডাকব আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে, যা আমাদের কোনো উপকার করে না এবং ক্ষতি করে না? আর আল্লাহ আমাদের পথ দেখানোর পর আমাদের কি ফেরানো হবে আমাদের পশ্চাতে সেই ব্যক্তির ন্যায় যাকে শয়তান জমিনে এমন শক্তভাবে পেয়ে বসেছে যে, সে দিশেহারা? তার রয়েছে সহচরবৃন্দ, তারা তাকে সঠিক পথের দিকে ডাকে, ‘আমাদের কাছে আসো’। বলো, ‘আল্লাহর পথই সঠিক পথ। আর আমরা রাববুল আলামীনের আনুগত্য করতে আদিষ্ট হয়েছি’।”[৭]

তৃতীয়ত : জাদুবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া এবং এর প্রচারণা

বহুসংখ্যক গেইমসের মাধ্যমেই এ কাজটি করা হয়ে থাকে। যেমন :

হ্যারি পটার নামক বিখ্যাত মুভির উপর ভিত্তি করে যে গেইম তৈরি হয়েছে তা এর একটি ভালো উদাহরণ। এখানে দেখানো হয় হ্যারি পটার জাদুবিদ্যার স্কুল “হোগওয়ার্টস স্কুল অফ উইচক্রাফট অ্যান্ড উইজার্ডি” তে পড়াশোনা করে। এতে দেখানো হয় সে ঝাড়ুর উপর চড়ে উড়ে বেড়ায়, কখনো-বা জাদুর কাঠি দিয়ে নানা রকম কসরত দেখায়, জিনিসপত্রকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। এমনকি জাদুর মন্ত্র দিয়ে সে জিনিসপত্রের রূপও পালটে ফেলে।

ক্যাসল শিকিগামি নামের গেইমটি জাদুবিদ্যা, অশরীরী আত্মার উপস্থিতি, রাশিচক্র পাঠ এসব বিষয়কে উৎসাহিত করে।

বিখ্যাত টিভি অনুষ্ঠান ‘ইউ গি ওহ’ এর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা গেইমটিতেও এ রকম সমস্যা আছে। এখানে জাদুবিদ্যা, পশুপাখি, ফেরাউন এবং পুনর্জন্মের ধারণা কিংবা আত্মার স্থানান্তরের বিষয়গুলো এসেছে। দেখানো হয়েছে যে

---

[৬] সূরাহ ইখলাস, ১১২ : ১-৪

[৭] সূরাহ আনআম, ৬ : ৭১

ফেরাউনের আত্মা নায়কের আত্মার সাথে বিনিময় হয়েছে। তার দাদা তাকে যে ধাঁধা দেয় তার সমাধান করায় এমনটি সম্ভব হয়েছিল।

চতুর্থত : তারকারাজির সাথে সম্পর্কিত

কিছু গেইমে দেখা গিয়েছে কেউ কেউ অদৃশ্য কিংবা গায়েবের শক্তিকেও অতিক্রম করে যাচ্ছে। এভাবে বিশ্বজগৎ কিংবা তারকারাজির জগৎ সম্পর্কে মিথ্যা ধারণার প্রসার ঘটে।

দ্যা বাউন্সার নামের এক গেইমে ডমিনিক ক্রস নামে এক মেয়েকে দেখানো হয় যে কিনা সবার জন্য সৌভাগ্যের তারা হিসেবে কাজ করে। যার সাথেই তার দেখাসাক্ষাৎ হয় তারই সৌভাগ্য ফিরে আসে এবং সে সম্পদশালী হয়ে ওঠে।

এভাবেই আমাদের সন্তানেরা শিখছে যে সৌভাগ্যের জন্য একটা তথাকথিত তারা রয়েছে এবং দুর্ভাগ্যের জন্যও একটা তারা দায়ী। আমাদের অবহেলায় আমাদের সন্তানেরা এমন সব মিথ্যা প্রতারণার কথা শিখছে যা সাধারণত গণকেরা বলে থাকে।

আমাদের সন্তানদের মনে এ বিশ্বাসও জন্ম নিতে পারে যে, এই ডমিনিক ক্রস নামক নারী সৌভাগ্য কিংবা সম্পদ দিতে পারে। সে মানুষের রিযিক কিংবা সুখ-সমৃদ্ধি বাড়িয়ে দিতে পারে। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের একত্ব নিয়ে তারা যেই জুলুম করে তিনি তার চেয়ে অনেক উঁচুতে।

পঞ্চমত : আমাদের প্রিয় নবী ﷺ-কে কটাক্ষ ও অবমাননা করা

ডেনমার্কের এক কুখ্যাত কোম্পানি এমন এক গেইম বাজারজাত করেছে যাতে রহমতের নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে একটা চরিত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে। গেইমে আম্মাজন আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-কেও চিত্রায়িত করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে রাসূল ﷺ মা আয়িশার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

বিজ্ঞাপনে অনেকটা এমনভাবে লেখা ছিল : "গেইমটি খেলার সময় তুমি নিজেকে নবী মুহাম্মাদ হিসেবে কল্পনা করো যার ২৩ জন স্ত্রী ছিলেন। এদের মধ্যে একজন ছিল ৬ বছরের বালিকা আয়িশা"। মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে নোংরা এবং কুরুচিকর মিথ্যা প্রচারণার এটা ছিল কেবল একটা অংশ মাত্র।

বিজ্ঞাপনে 'হালাল' শব্দটিও যুক্ত করা হয় যাতে ধারণা জন্মে গেইমটি খেলা হালাল।[৮]

দ্বীনের ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রুপ কিংবা দ্বীন বিকৃতির একটা পদ্ধতি ছিল এটি।

ষষ্ঠত : কুফরের আলামতের উপস্থিতি

এ সমস্ত গেইমগুলোর অনেকগুলোতেই পুরোহিত, রাব্বি কিংবা গৌতম বুদ্ধের উপাসনাকারীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকার প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে। অনেক গেইমের নায়ককে ক্রস পরতে দেখা গিয়েছে। ফুটবল গেইমগুলোতে খেলোয়াড় যখন গোল দেয় তখন গোল উদ্‌যাপনের জন্য তারা তাদের বুকে আঙুল দিয়ে ক্রস এঁকে দেখায়।

এমনকি অনেক গেইম খেলা চালিয়ে যাবার জন্য ক্রস অর্জন নামের একটা ধাপও রেখেছে। অর্থাৎ ক্রস জোগাড় করলেই কেবল খেলাটি চালিয়ে যেতে পারবেন। অথবা ক্রস অর্জনের মাধ্যমে খেলায় মরে যাবার পর নতুন সুযোগ পাওয়া কিংবা এর মাধ্যমে শক্তি অর্জনের বিষয়গুলোও থাকে।

এভাবে খেলোয়াড়দের কাছে অবচেতন মনেই ক্রসের প্রতি একটা দুর্বলতা সৃষ্টি হয়।

এভাবে এ সমস্ত গেইমস আমাদের সন্তানদের কাছে ঈসা عليه السلام-এর মিথ্যা ক্রুশবিদ্ধের ঘটনাটিকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পাঁয়তারা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ এই বিশ্বাসকে আল্লাহ কুর'আনে সুস্পষ্ট মিথ্যা বলেছেন। আল্লাহ বলেন :

> **"এবং তাদের এ কথার কারণে যে, 'আমরা আল্লাহর রাসূল মারইয়াম পুত্র ঈসা মাসীহকে হত্যা করেছি'। অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং তাকে শূলেও চড়ায়নি; বরং তাদের ধাঁধায় ফেলা হয়েছিল। আর নিশ্চয় যারা তাতে মতবিরোধ করেছিল, অবশ্যই তারা তার ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে ছিল। ধারণার অনুসরণ ছাড়া এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। আর এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি।"**[৯]

---

[৮] নাবা নিউজ, শুক্রবার, ২০ অক্টোবর, ২০০৬ খ্রি.

[৯] সূরাহ নিসা, ৪ : ১৫৭

সপ্তমত : ইসলামের বিধিবিধানের অবমাননা এবং তরুণদের মন থেকে এসবের প্রতি সম্মান সরিয়ে নেওয়া

অনেক গেইমে খেলোয়াড়কে বলা হয় সে যত বেশি মসজিদ ধ্বংস করতে পারবে তত পয়েন্ট অর্জন করতে পারবে। একজন পিতার অভিব্যক্তি শুনুন :

> "আমার সন্তান যখন ভিডিও গেইম খেলছিল তখন আমি একই সাথে আজানের সুর, বোম্বিং এবং গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাই। আমি চরম কষ্ট পেলাম যখন আমার ১২ বছরের ছেলেকে দেখলাম যে সে গেইমের মধ্যে মসজিদ ও মসজিদ-সংশ্লিষ্ট সকল জিনিসপত্র ধ্বংস করে যাচ্ছে। ১২ বছরের একটা ছেলের জন্য মসজিদ ধ্বংস করে পয়েন্ট অর্জন করার বিষয়টি হয়তো অতটা গুরুতর কিছু নয়।"
>
> তিনি আরও বলেন, "আমি যখন আমার ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন তুমি মসজিদ ভাঙছ বাবা? উত্তরে সে বলল, এটা ভাঙা ছাড়া আমি পরের স্টেজে যেতে পারব না।"

আরেকটা গেইমে এমন আছে যে, যদি আপনি জিততে চান, তাহলে আপনাকে পবিত্র কুর'আনের নির্দিষ্ট পরিমাণ কপিতে গুলি করতে হবে। এরপরই কেবল আপনি বিজয়ধ্বনি শুনতে পাবেন। এমনকি আজানের সময় কিংবা মানুষ মসজিদে ঢোকার সময় ধরে ধরে হত্যা করার বিষয়গুলোও সেখানে রয়েছে!

মহান আল্লাহ্ বলেন :

> **"এটাই হলো আল্লাহর বিধান; যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে, নিঃসন্দেহে তা অন্তরের তাকওয়া থেকেই।"[১০]**

অষ্টমত : কাফেরদের প্রতি ভালোবাসা এবং তাদের অনুকরণ

এটা বিভিন্নভাবে করা হয়। মূলত নায়ক চরিত্রে কাফিরদের দেখানো হয়। স্বাভাবিকভাবেই নায়কের অনেক শক্তি আর ক্ষমতা থাকে। ফলে এসব গেইম যারা খেলে তারা স্বাভাবিকভাবেই এ সমস্ত চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং তাদেরকে মনের অজান্তেই ভালোবাসতে থাকে। এর ফলাফলে যা হয় তা খুবই স্বাভাবিক। ছেলেপুলে এই চরিত্রগুলোর অঙ্গভঙ্গি থেকে শুরু করে প্রতিটি কাজকর্ম এমনকি কাপড়-চোপড়েরও অনুকরণ করতে থাকে। রাস্তাঘাটে গলায় নেকলেস

---

[১০] সূরাহ হাজ্জ, ২২ : ৩২

আর হাফপ্যান্ট কিংবা ছোট কাপড় পড়া লোকজন আমাদের কার না চোখে পড়েনি? এগুলোর পেছনে যে ভিডিও গেইমসের প্রভাব আছে তা আশা করি বুঝতে কারোর বাকি নেই।

একজন মায়ের মুখে তাঁর ছেলের বর্ণনা দেখা যাক।

> "একদিন আমার ছেলেকে একটা বড় নেকলেস পরতে দেখে অবাক হলাম। অথচ তার বয়স ছয় পেরোয়নি। আরও দেখলাম সে র‍্যাপ সংগীত শিল্পীদের মতো মাথায় ক্যাপ পরে, ওরা যেভাবে হেলেদুলে হাঁটে সেভাবে হাঁটছে। আবার তাদের মতোই অঙ্গভঙ্গি করছে। আমি হুট করে চোখ বন্ধ করে আবার খুললাম। আমার বিশ্বাস হতে চাচ্ছিল না আমি সত্য দেখছি কি না। চোখ খুলে আমি সেই একই জিনিসই দেখলাম। প্রচণ্ড রাগ হলো। কিন্তু আমি রাগের মাথায় তাকে মারতে যাইনি। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়ার চিন্তা করলাম। ঠান্ডা মাথায় ভাবলাম যে এর কারণ কী হতে পারে। চিন্তা করে আমি এর মূল কারণ খুঁজে বের করলাম। এবং কোনোরকম কালক্ষেপণ না করে ওটাকে ঘর থেকে বিদায় করলাম। হ্যাঁ, ওটা ছিল একট প্লে-স্টেশনের কাজ।"

দ্বিতীয় সমস্যা : ইসলাম এবং মুসলিমদের বিকৃতভাবে উপস্থাপন

এসব গেইমে মুসলিমদের বর্বর, সন্ত্রাসী, মূর্খ, নির্বোধ ইত্যাদি নানা বাজে গুণের অধিকারী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। উদ্দেশ্য থাকে লোকেরা যাতে ইসলাম এবং মুসলিমদের সাথে শত্রুতা দেখাতে কিংবা ঘৃণা প্রদর্শনে বাধ্য হয়।

এই ধরনের গেইমস সম্প্রতি খুব চলছে। এটা ইসলাম এবং ইসলামের শত্রুদের মধ্যে চলমান যুদ্ধে একটা অস্ত্র হিসেবে কাজ করছে। শত্রুতা ইসলামকে সন্ত্রাসের সাথে মিলাতে গিয়ে এসব কাজ করে থাকে। এটা তো আল্লাহর সেই কথারই স্পষ্ট প্রতিফলন যেখানে তিনি বলেন :

> **"হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না। তারা তোমাদের সর্বনাশ করতে ত্রুটি করবে না। তারা তোমাদের মারাত্মক ক্ষতি কামনা করে। তাদের মুখ থেকে তো শত্রুতা প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে। আর তাদের অন্তরসমূহ যা গোপন করে তা অধিক ভয়াবহ। অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্ট বর্ণনা করেছি।**

যদি তোমরা উপলব্ধি করতে।”[১১]

একজন কাস্টমস কর্মকর্তা জানিয়েছেন কেন তিনি একটা নির্দিষ্ট গেইমকে দেশে ঢুকতে দেননি। তিনি জানান, “এটা ইসলামকে অবমাননা করেছে এবং ইসলামকে একটা সন্ত্রাসের ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করেছে।”

কিছু উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়

প্রথম উদাহরণ : সন্ত্রাস এবং আল কুর’আন

‘ফার্স্ট টু ফাইট’ নামের একটা গেইমে বৈরুতের একটি মুসলিম এলাকা দেখানো হয়, যেখানে কিছু মুসলিম সন্ত্রাসী আশ্রয় নেয়। দেখানো হয় গেইমের হিরোরা তাদের এলাকায় ঢুকে তাদেরকে বাগে আনার চেষ্টা করছে।

শত্রুর আক্রমণের কবলে পড়া পশ্চিমের একটা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেখানো হয় একটা গেইমে। নায়কেরা ইসলামিক লাইব্রেরিতে ঢুকে এর গার্ডদের মেরে ফেলছে এবং বাকি যারা ছিল তাদেরও গণহারে মারছে। এরপর বিজয়ের দৃশ্য দেখানো হয়। সেই দৃশ্যে দেখা যায় লাইব্রেরির সব বই নিচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, আর যেগুলোর গায়ে লেখা “পবিত্র কুর’আনের শিক্ষা”।

এভাবেই পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয় রক্ষার মাধ্যমে গল্পের নাটকীয়তা শুরু হয়। এবং শেষ হয় মুসলিমদের পরাজিত করে তাদের বইগুলোকে মাটিতে ফেলে দেওয়ার মাধ্যমে। কৌশলে বোঝানো হয় এ বইগুলো থেকেই তারা সন্ত্রাসের শিক্ষা পেত।

এ সম্বন্ধে আর কীই-বা বলার আছে! এই বিষাক্ত জিনিসগুলোই আজ আমাদের ছেলেমেয়েদের সামনে, এগুলোতেই তারা আসক্ত।

দ্বিতীয় উদাহরণ : ইসলাম ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এমনটা প্রচার করা

একটা গেইমের শেষ দৃশ্যে নায়কের বিজয়ের যে দৃশ্য দেখানো হয় তা অনেকটা এ রকম, নায়ক মসজিদে গুলি করতে করতে আসছে এবং মসজিদের গার্ডদের মেরে ফেলছে। যেই মুহূর্তে নায়ক জয়লাভ করে তখনই আজানের ধ্বনি বেজে আসছে। যেন বোঝানো হচ্ছে, এরই মাধ্যমে মুসলিমদের ধ্বংস আজ সুনিশ্চিত হলো। ইসলাম এবং মুসলিম আজ তাদের কাছে হার মানল । এবার তারা ইসলাম আর মুসলিমদের নিয়ে যা খুশি তা-ই করতে পারে!

---

[১১] সূরাহ আলে ইমরান, ৩ : ১১৮

অথচ কথা ছিল আমাদের সন্তানেরা আল্লাহর প্রতিটি বিধিবিধানকে ভালোবাসবে। অন্তরে অনুভব করবে দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা। আজানের সুর শুনে তাদের মন আল্লাহর প্রশংসায় আবেগে ভরে উঠবে এবং কুফুরি আকিদা-বিশ্বাস থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চলবে। সেখানে এই গেইমগুলো কী শিখিয়ে যাচ্ছে আমাদের সন্তানদের? এই গেইমগুলো দ্বীন-ধর্ম সম্পর্কে খুব সূক্ষ্মভাবে আমাদের মনে বিতৃষ্ণা ঢুকিয়ে দিচ্ছে। বোঝানো হচ্ছে আল্লাহর দ্বীনের কোনো অংশকে ধ্বংস করার মাধ্যমেই প্রকৃত বিজয় আসে!

তৃতীয় উদাহরণ : কুর'আন এবং মৃত্যু

কোনো একটা ভয়ংকর দৃশ্যপট, যেমন কোনো বীভৎস হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যের সময় কিছু গেইমের ব্যাকগ্রাউন্ডে কুর'আন তিলাওয়াত ছেড়ে দেওয়া হয়। একজন বিখ্যাত ক্বারী যিনি সকলের কাছেই পরিচিত তাঁর সুন্দর তিলাওয়াত ভেসে আসে এমন হত্যাযজ্ঞের দৃশ্যের সময়।

হ্যাঁ, ঠিক এমনটাই কিছু গেইমে দেখানো হচ্ছে আজকাল।

আমাদের কিছুটা অবহেলার সুযোগেই আমাদের সন্তানেরা অজান্তেই শিখে যাচ্ছে যে বীভৎস হত্যাযজ্ঞের সাথে কুর'আনের বহু পুরনো সম্পর্ক। তাদের মনে অবচেতনভাবেই কুর'আনের ব্যাপারে এক অজানা ভীতির জন্ম নিচ্ছে।

আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, কীভাবে? উত্তরে বলা যায়, প্রতিবারই যখন গেইমে একজন মারা যায় তখনই সেই সুরেলা তিলাওয়াতটা বেজে ওঠে। আল্লাহর শত্রুরা তো এটাই চায়, যেন কুর'আন শুনে অজানা ভীতি আমাদের ঘিরে ধরে।

ওরা আমাদের শিশু এবং কিশোরদের ভয়ের মধ্যে রাখতে চায়। বোঝাতে চায় এ ইসলাম ধর্ম এসেছে তোমাকে মৃত্যু নিয়ে ভয় দেখাতে। তারা গেইমে দেখাবার চেষ্টা করে ইসলামের প্রতিটি বিষয়, হোক সেটা কুর'আন কিংবা আল্লাহর রাসূলের হাদীস কিংবা আলেমদের লেকচার, এদের প্রত্যেকেই মৃত্যু নিয়ে কথা বলে। অর্থাৎ এ ধর্মটা এমন যে, এখানে মৃত্যু এবং মৃত্যু নিয়ে কথা বলা ছাড়া আর কিছুই নেই।

বাচ্চারা স্বাভাবিকভাবেই আনন্দপ্রিয়। পরিণত বয়সের জটিলতা নিয়ে চিন্তা করবার মতো ফুরসত কোথায় এদের? এরা স্বভাবতই চায় না নিজেদের জীবনকে কঠিনভাবে দেখতে।

এই গেইমগুলো তাদের বোঝায়, ধর্ম মানেই মৃত্যু। এ জন্যেই আপনি দেখবেন ইসলামের সাথে সামান্যতম সম্পর্ক আছে এমন বিষয়গুলো অনেক সময় কিশোরেরা এড়িয়ে যাচ্ছে।

চতুর্থ উদাহরণ : ইসলামিক রাষ্ট্র কিংবা সংগঠনগুলোর কাজই হচ্ছে সন্ত্রাস এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালানো এবং এর পরিণতিতে তাদের নিজেদের ধ্বংস হওয়া

একটা গেইম আছে যেখানে দেখানো হয় যে ইসলামিক দেশগুলো হচ্ছে সন্ত্রাস এবং ধ্বংসযজ্ঞের মূল হোতা।

এখানে কোনো লুকোচুরি করা হয়নি, যা দেখানোর একেবারে স্পষ্টভাবে দেখানো হয়। এতটাই স্পষ্ট যে তা বোঝার জন্য আপনার রকেট সাইন্স জানার দরকার নেই।

এই গেইমের গল্পে দেখানো হয় কীভাবে একটা সন্ত্রাসবাদী দেশকে যৌথবাহিনী পরাজিত করছে। গেইমের শুরুতে একটা ছোট ভিডিও ক্লিপ থাকে। এতে দেখানো হয় বাজে চেহারার একজন দাড়িওয়ালা লোক তার লোকজনকে বলছে : “পুরাতন দেশের ধ্বংসাবশেষের উপর আমরা এক মহান দেশ নির্মাণ করেছি। আমরাই আফ্রিকা মহাদেশ নতুন করে গড়ে তুলব। তবে এটা মাথায় রাখতে হবে নির্মাণ শুরু হবার আগে অবশিষ্ট সবকিছু ধ্বংস করেই আগাতে হবে।”

এভাবেই ইসলামিক দেশ এবং তাদের শাসকদের দেখানো হচ্ছে। যেন তারা ধ্বংসের প্রতিচ্ছবি। ইচ্ছা করেই এমন একটা দৃশ্যপটের অবতারণা করা হয় যেখানে দেখানো হয় একটা শহরের ধ্বংসের উপরে আরেকটা শহরের সূচনা হবে।

দেখানো হয় যে ধ্বংসযজ্ঞ এই সমস্ত দেশের সাময়িক কোনো কর্মসূচি নয়; বরং এই সাম্রাজ্যের ভিত্তিই ধ্বংসের উপর স্থাপিত। অন্যের প্রতি শত্রুতাই এর মূল রণকৌশল। যুদ্ধ-সংক্রান্ত নিয়মনীতি কিংবা শান্তিচুক্তির ধার না ধেরে কীভাবে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো যায় তার জন্যেই ওত পেতে থাকে এরা।

গেইমের শুরুর ক্লিপটি আরও কিছুক্ষণ চলে। ওখানে দেখানো হয় যৌথবাহিনী ইসলামিক শাসকের কাছে একজন দূত পাঠায়। দেখানো হয় এই হিংস্র শাসকের ভয়ে প্রতিনিধি চুপসে যাচ্ছে। এরপর সেই নেতা দূতকে হত্যার আদেশ দেন। উত্তেজিত মুসলিম জনতা চিৎকার করে তার সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানায়।

এই চাতুর্যপূর্ণ ভূমিকার মাধ্যমে এই নোংরা গেইমটি শুরু করা হয়। দেখানো হয় একটা ইসলামিক রাষ্ট্রে যুদ্ধ হচ্ছে। এলাকার সামগ্রিক আকার আকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য খুব পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়। যৌথবাহিনী যখন সম্মিলিত আক্রমণে যায় তখন মুসলিম নেতা খুব নাজুক অবস্থায় পড়ে যান।

তার সহযোগীরা তাকে প্রাইভেট বাহিনীর সাহায্য চাওয়ার পরামর্শ দেয় এবং রণকৌশল পরিবর্তনের পরামর্শ দেয়।

কিন্তু নেতা খুব উত্তেজিত হয়ে শুধু একটা কথাই বলে, “জয় কিংবা শহীদ হওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপায় আমাদের কাছে নেই, তোমাদের কোনটা পছন্দ?” পুরো কাহিনিজুড়ে আলোচনাটা চলতে থাকে। তার সহযোগী জানায় : “নেতা, বিজয়ই আমাদের পছন্দ”।

এই দৃশ্যপট থেকে আমাদের সন্তানেরা কী শিখবে বলে আমরা আশা করব? তাদের অন্তরে কী প্রভাব পড়বে যখন তারা কুরআনের পাতায় আল্লাহর সেই আয়াতটি পড়বে যেখানে বলা হয়েছে :

> **“বলো, ‘তোমরা কেবল আমাদের জন্য দুটি কল্যাণের একটির অপেক্ষা করছ, আর আমরাও তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি যে, আল্লাহ্ তোমাদের তাঁর পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হাত দ্বারা আযাব দেবেন। অতএব তোমরা অপেক্ষা করো, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ।”**[১২]

শায়খ আব্দুর রহমান আস সাদি ﵀ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

> “আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া, দুনিয়া ও আখিরাতে লাভবান হওয়া কিংবা শাহাদাতবরণ উভয়ই সৃষ্টিকুলের মধ্যে তাকে শ্রেষ্ঠতম মর্যাদার আসনে বসিয়ে দেয়। আল্লাহর কাছেও তাদের জন্য রয়েছে উঁচু মাকাম।”[১৩]

গেইম শেষ হয় যৌথবাহিনীর বিজয় দিয়ে। দেখানো হয় তারা সন্ত্রাসী সাম্রাজ্যকে বীরদর্পে ধ্বংস করেছে। মুসলিম বাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং যৌথবাহিনী তাদের হত্যা করে। যেন একই সাথে মুসলিম বাহিনী বরণ করে নিল পরাজয়, আত্মসমর্পণ ও মৃত্যুর লাঞ্ছনা!

একটা দৃশ্যে দেখানো হয় “আল্লাহু আকবর” বলে তাকবির দেবার পরপরই একজন সৈন্যকে হত্যা করা হচ্ছে। যেন বোঝানো হয়, “ওরে নাদান! আমাদের জিম্মায় থাকাকালীন তোর মহান আল্লাহ তোকে কোনো সাহায্যই করতে পারবে না!”

পঞ্চম উদাহরণ : আরবরা হচ্ছে অসভ্য , মূর্খ এবং কাপুরুষ

---

[১২] সূরাহ তাওবা, ৯ : ৫২

[১৩] তাইসীর আল কারিম আর রাহমান : পৃষ্ঠা ৩৪০

“মেটাল স্লাগ” নামের এক গেইমে দেখানো হয় দুজন নৌ সেনাকে আরব দেশে মিশনে পাঠানো হয়। এই গেইমে দেশগুলোকে খুব স্পষ্টভাবেই দেখানো হয়। দুইজন নৌ সেনার দায়িত্ব হলো যত পারো আরবদের মারো।

এই সৈনিকেরা ন্যায়ের পক্ষে আরবদের নোংরা যুদ্ধকৌশলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এমনটাও দেখানো হয়। তারা যুদ্ধে শত্রুদের মুখোমুখি হয় না বলে দেখানো হয়। একই সাথে এটাও দেখানো হয় যে, আমেরিকান সেনারা অত্যাধুনিক অস্ত্র দিয়ে খুব সহজেই আরবদের কচুকাটা করছে।

ষষ্ঠ উদাহরণ : মুসলিম সন্ত্রাসী

মুসলিমদের সম্বন্ধে বিষোদ্গারের বিষয়টি শুধু সন্ত্রাসের সাথে জড়িত নির্দিষ্ট দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং ব্যক্তিগত পর্যায়েও এটা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিছু গেইম কিছু বিশেষ বিশেষ চরিত্র নিয়ে এসেছে গেইমের মধ্যে। এসব চরিত্রকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। যেমন :

মুহাম্মদ ইবনু ফয়সাল আল খালিফাহ : ইনি একজন সৌদি শায়খ এবং রসায়নবিদ। গেইমে দেখানো হয় উনি একটা গোপন সংঘের সাথে যুক্ত যারা নিষিদ্ধ প্রাণীজ পদার্থ তৈরি করে। তারা মুহাম্মদ ইবনু ফয়সালের হোটেলে তাকে হত্যার জন্যে ওত পেতে থাকে। উনি আসার পর তাকে বন্দী করে তার গার্ডদের হত্যা করা হয়। অবশেষে স্বয়ং তাকেই হত্যা করা হয়।

তারিক আব্দুল লতিফ : উনাকে দেখানো হয় এমন একজন স্কলার হিসেবে যিনি লোকচক্ষুর আড়ালে কাজ করতে ভালোবাসেন। তার চিন্তাগুলো খুবই মারাত্মক। তিনি জেনেটিক কোড পরির্বতন করে সেগুলোর স্যাম্পল বিক্রির চেষ্টা করেন।

এভাবে যখনই আরব কিংবা তার আশপাশের অঞ্চলের কাউকে দেখানো হয়, যেমন আল খলিফাহ বা তারিক আব্দুল লতিফ, তাদের খুব নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়। যদি ব্যক্তিটি কোনো বিজ্ঞানী হয়ে থাকে, তাহলে দেখানো হয় যে তার বিজ্ঞানচর্চা সন্ত্রাস, ধ্বংসযজ্ঞ কিংবা আগ্রাসন পরিচালনার হাতিয়ার হিসেবেই প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে।

সমাজের এই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গেরই যদি এই হাল হয়, তাহলে পুরো সমাজের অবস্থা কেমন? সমাজের জ্ঞানীগুণীদেরই যদি এ রকম নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়, তাহলে আমজনতার ব্যাপারে কেমন হবে তা বলাই বাহুল্য।

যে গেইমগুলো ইসলাম এবং মুসলিমদের বিকৃতি সাধনে তৎপর

লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ইতিহাসের প্রফেসর ফিলিপ টেইলরের একটি বিখ্যাত বই আছে। নাম *মিউনিশন্স অফ দ্য মাইন্ড*। এখানে তিনি যুদ্ধকালীন প্রোপাগান্ডা কিংবা যুদ্ধাবস্থায় মিডিয়ার ভূমিকার বিষয়টা তুলে ধরেছেন এভাবে :

> "যুদ্ধ যেমন সহিংসতার মোড়কজাত নাম, প্রোপাগান্ডা আর মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ তেমনি অন্যকে প্ররোচিত করার পোশাকি নাম। রণক্ষেত্রে একটা অস্ত্র দিয়ে যেভাবে শরীরের একটা অংশকে ঘায়েল করা যায়, স্বাভাবিক সময়ে সেভাবে কিন্তু করা যায় না।"

যুগ যুগ ধরে পশ্চিমাদের কাজ হলো মিডিয়ার মাধ্যমে শত্রুদের নাস্তানাবুদ করে রাখা। সেনাবাহিনী পাঠিয়ে মূল ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর বহু আগেই তারা মুসলিমদের মাঝে পরাজিত মানসিকতার বীজ বুনে দিয়েছে। পরাজয় নিশ্চিত এমন মানসিকতা নিয়ে মুসলিমরা কাফের সভ্যতাকে আদ্যোপান্ত অনুসরণ করে চলেছে। কেন জানি বিজয়ী পক্ষের অন্ধ অনুসরণেই পরাজিত পক্ষ সব সময় অদ্ভুত এক মোহ খুঁজে পায়।

এতটুকুতেই পশ্চিমারা থেমে থাকেনি। এই পরিকল্পিত মনস্তাত্ত্বিক আক্রমণ শুধু উঠতি বয়সের কিশোরদের আক্রান্ত করেই থেমে থাকেনি। তারা ছোট ছোট বাচ্চাকাচ্চাকেও এর শিকার বানিয়েছে। শিশুদের ক্ষেত্রে এই বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করা হয় অনেক কম বয়সেই। লম্বা সময় ধরে এটা বৃদ্ধি পায় এবং পরিণত বয়সে এর বিষাক্ত ফলগুলো দেখা যায়।

তবে এই ভিডিও গেইমসের আক্রমণটা আগের কৌশল থেকে একটু আলাদা। আগে যেটা করা হতো মিডিয়ার মাধ্যমে শ্রোতা-দর্শকদের তাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত করা হতো। আর ভিডিও গেইমসের পদ্ধতিটা হলো আমাদের সন্তানেরা পশ্চিমের তৈরি করা গেইমস খেলছে এবং এসবে ঢুকিয়ে দেওয়া তাদের আদর্শের সাথে একমত পোষণ করছে এবং অজান্তেই তাদের আদর্শ রক্ষার মিশনে নেমেছে।

এই বিষাক্ত গেইমগুলো দ্বারা যে কেবল মুসলিম ছেলেপুলেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এমনটি নয়; বরং পশ্চিমে যাদের মধ্যে হয়তো ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো যেত তারাও ইসলাম সম্পর্কে ঘৃণা নিয়ে বড় হচ্ছে। তাদের সামনে ইসলামের একটি বিকৃত রূপ উপস্থাপন করা হয়েছে। এ মিথ্যা ধারণাগুলো তাদের মন-মগজ থেকে

সরাতে প্রচুর পরিশ্রমের প্রয়োজন। হয়তো এই কঠোর পরিশ্রম দিয়েই আমরা ইসলামের সঠিক রূপটি তাদের সামনে নিয়ে আসতে পারব।

তৃতীয় সমস্যা : বাজে আচার আচরণ এবং নোংরামির প্রতি ভালোবাসা তৈরি

অনেক গেইম আছে যা আমাদের তরুণ প্রজন্মের অন্তরে বাজে আচরণ এবং নোংরামির প্রতি ভালোবাসা তৈরি করে দিচ্ছে। যদিও তাদের কাহিনিতে ভিন্নতা থাকে, কিন্তু দিনশেষে সব গেইমই একই ফলাফল বয়ে নিয়ে আসে। অনেক সময় এ ধরনের নোংরা আচরণের মাত্রা কমবেশি হতে পারে। হয়তো কেবল নোংরামিই গেইমের মৌলিক বিষয় না, অথবা এসব নোংরামি গেইমের নানান ঘটনার মাঝে হঠাৎ করে উপস্থিত হয়।

কিশোরদের উপর এসব গেইমের প্রভাব কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। হ্যাঁ, হতে পারে এ ক্ষেত্রে কে কতটুকু প্রভাবিত হচ্ছে তার মাত্রায় কিছুটা ভিন্নতা থাকে। এসব গেইমে হত্যাযজ্ঞ, চুরি, জুয়া, নাচানাচি এবং আরও নোংরা জিনিসপত্র দেখানো হয়। যারা এসব গেইম খেলে ধীরে ধীরে তাদের মনোজগতে এ ধরনের নোংরা কাজের প্রতি দুর্বলতা জন্মায়। শেষমেশ নিষিদ্ধ কাজকর্মগুলোই তাদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠতে থাকে।

এসব ক্ষতিকর চারিত্রিক দিকগুলোকে আমরা মোটাদাগে ৩টি ভাগে ভাগ করতে পারি :

১. সন্ত্রাস, প্রতারণা, চুরি ইত্যাদির প্রতি আহ্বান।

একটি গেইমে দেখা যায় নায়ক সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলছে : “আমার কথামতো চলো। এই কাজগুলো করলে তোমরা তোমাদের আত্মা ফিরে পাবে।”

গেইমের শুরু হয় কিছু ফিল্ম স্টারদের দেখানোর মধ্য দিয়ে। আরও থাকে জুয়ার আসর এবং নারী। এরপর আক্রমণস্থলে প্রবেশের জন্য নায়কের কাছ থেকে জোরালো ডাক আসে, আর তখনই সে উপরে উল্লেখিত কথাগুলো বলতে থাকে।

এরপর মূল দৃশ্য শুরু হয়। সন্ত্রাসীরা পুলিশের উপর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। এক বন্দুকধারীকে দেখা যায়, যে তার সামনে কাউকে বন্দুক নিয়ে দাঁড়াতে দেখলেই হত্যা করছে। আরও দেখা যায় একজন মহিলাকে তার বাসায় ঢোকার সময় মেরে ফেলা হয়। এই হত্যাকাণ্ড আবার যেনতেনভাবে দেখানো হচ্ছে না। একটি বুলেট

এসে সেই মহিলার শরীর থেকে ঘাড়, মাথা সব আলাদা করে ফেলছে—এত বীভৎসভাবে হত্যাকাণ্ডকে গেইমে উপস্থাপন করা হয়।

এরপর দেখা যায় নায়কের সাথে কিছু নারীও দৃশ্যপটে উপস্থিত। নারকীয় হত্যাযজ্ঞের কাহিনি দেখানো হয়। গুলি করে মেরে ফেলছে, পেট কেটে ছিঁড়ে ফেলছে, শরীর থেকে ঘাড় নামিয়ে ফেলছে! গল্পের নায়ক একটা গাড়ির মালিককে ধরাশায়ী করে রাস্তায় ফেলে দেয় আর তার গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়। এরপর সে তার তথাকথিত দুঃসাহসিক অভিযানে বেড়িয়ে পড়ে, যার পরতে পরতে আছে মেয়েদের সাথে নোংরা সম্পর্কের কাহিনি।

আরেকটা গেইমে দেখানো হয় আইনের লঙ্ঘন হচ্ছে জেনেও খেলোয়াড় কাজটি করে যেতে থাকে। বিষয়টি তারা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছ থেকে গোপন করে। এবং এই আইন লঙ্ঘনের ব্যাপারটা পুলিশ ধরতে পারেনি বলে তাদের নিয়ে হাসাহাসি করে। এ যেন আইন লঙ্ঘনের প্রতি সুস্পষ্ট আহ্বান। এসব দেখে দেখেই শিশু-কিশোরেরা সন্ত্রাস এবং বিশৃঙ্খলার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

আরেকটা গেইম তো সরাসরি সন্ত্রাসী হতে আহ্বান জানায়। খেলোয়াড়কে বলা হয়, “সন্ত্রাসী হয়ে যাও”। পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে মিশনগুলো শেষ করার চেষ্টা করো, নয়তো তুমি খুব সহজেই তাদের হাতে ধরা পড়বে।

এভাবেই মিথ্যা আর অপরাধের জগতে কীভাবে বিজয়ী হতে হয় সেদিকে আমাদের শিশু-কিশোরদের আহ্বান করা হচ্ছে। তারা যেন জীবনের সর্বস্ব দিয়ে এই অপরাধের জগতে লিপ্ত হয় তার রাস্তাও তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। এসব গেইমে যখন মরে গেলেই একটা নতুন জীবন সহজেই পাওয়া যায়, তখন জীবন দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে দোষ কী?

কিছু কিছু গেইমে জুয়া খেলার ক্যাসিনোও দেখানো হয়। দেখা যায় খেলোয়াড় লাস ভেগাসে গিয়ে বিভিন্ন জুয়া খেলায় অংশ নেয়।

গ্র্যান্ড থেফট অটো বা জিটিএ নামে একটা গেইম আছে। এ গেইমটা খুব জনপ্রিয় ও প্রচলিত একটা গেইম। যে বাড়িতে গেইম খেলার ব্যবস্থা আছে সে বাড়িতেই জিটিএ আছে—অনেকটা এমন অবস্থা। এই গেইমের গল্পটা এমন যে, একজন চোরকে পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই চোরের কাজ হলো মানুষ মারা, তাদের টাকা আত্মসাৎ করা, গাড়ি ছিনিয়ে নেওয়া। সে নানা ধরনের নোংরা বাজে কাজ করে বেড়ায়, বাজে কথা বলে, জুয়া খেলে এবং মদপান করে।

২. যৌনতা, পর্নোগ্রাফি এবং নৈতিক অবক্ষয়।

বর্তমানে অনেক গবেষকগণ বলছেন কিছু কিছু ছেলেমেয়ে বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছুবার আগেই যৌন আবেদন অনুভব করা শুরু করে। এমনকি শতকরা ১০ ভাগ ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে ৯ বছর বয়সেই যৌনানুভূতিগুলো জেগে ওঠে। অনেক পিতামাতার ধারণা তাদের সন্তানেরা এসব যৌন বিষয়াদি নিয়ে কিছুই জানে না বা বোঝে না। কিন্তু বিষয়টা আসলে এমন নয়। সত্যি বলতে কিছু বাচ্চাকাচ্চারা খুব অল্প বয়সেই যৌন আবেদন অনুভব করা শুরু করতে পারে।

কিছু গেইম তৈরিকারক কোম্পানি এই সংবেদনশীলতাটাকে কাজে লাগায়। তারা এমন সব গেইম বানাচ্ছে যা শিশু-কিশোরদের কাছে যৌনতা বা পর্নোগ্রাফিকে পরিচিত করে তুলছে।

চলুন কিছু উদাহরণ দেখা যাক। এসব দেখলে সহজেই বুঝে আসবে আমাদের শিশু-কিশোরদের সামনে যৌনতা কিংবা পর্নোগ্রাফি-সংক্রান্ত কী কী বিষয় নিয়ে আসা হচ্ছে :

১) কিছু কিছু গেইমে খোলাখুলি নগ্নতা দেখানো হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই নগ্ন ছবি বা চরিত্রগুলো গেইমের মূল বিষয়ের সাথে মোটেই সংশ্লিষ্ট নয়। যেন কিছু নগ্নতা দেখানোই ছিল এ সমস্ত কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য। উদাহরণ হিসেবে রেসিং গেইম কিংবা রেসলিং গেইমের কথা বলা যায়। এসব গেইমের শুরু বা শেষ বোঝাতে প্রায়ই অর্ধনগ্ন মেয়েদের দেখানো হয়।

২) কিছু গেইম শুরু হয় নগ্ন মেয়েদের নাচ দেখানোর মধ্য দিয়ে। গেইম চলাকালীন প্রায়ই এসব দেখানো হয়।

৩) একটি গেইমে বিজয়ীর পুরস্কার হলো নারীরা একটি একটি করে তাদের গায়ের কাপড় খুলে ফেলবে। যখনই খেলোয়াড় কোনো ধাপে জয় লাভ করে তখনই নারীরা তাদের শরীরের কিছু কাপড় খুলে ফেলে। এবং সর্বশেষ ধাপে জয় লাভ করলে চূড়ান্ত পুরস্কার হিসেবে দেখানো হয় সম্পূর্ণ নগ্নদেহের নারী!

৪) কিছু কিছু গেইমে সমকামিতাও প্রচার করা হয়।

৫) কিছু কিছু গেইম এসব যৌন সুড়সুড়িমূলক কাজকর্মের জন্যই জনপ্রিয়। যারা এ গেইমগুলো বানাচ্ছে তারা ইদানীং এমন সব প্রযুক্তি ব্যবহার করছে যা আগের প্রচলিত ধারার গেইমগুলোতে ব্যবহার করা হতো না। যেমন : প্যাশন ইন্ডেক্স কিংবা ইন্ডেক্স অব সেনসেশন। পর্দায় যে কর্মকাণ্ডগুলো হয় সেগুলোকে উত্তেজক

কিছুতে রূপান্তরিত করে শোনানো হয় বা বাহ্যিক অঙ্গভঙ্গির দ্বারা দেখানো হয়। মাঝেমধ্যে ত্রিমাত্রিক ছবির মাধ্যমেও এগুলো ফুটিয়ে তোলা হয় ।

এটা খুবই আশঙ্কাজনক ব্যাপার। ভার্চুয়াল জগতের যৌন উত্তেজক বিষয়গুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমাদের ঘরবাড়িতেও ঢুকে পড়েছে। ইন্টারনেটের ভালো-খারাপ উভয় দিকই আছে। এর নিজের বাছবিচারের কোনো শক্তি নেই।

সাত বছর বয়সী এক সন্তানের মা বলেন, "একদিন আমার বাচ্চার প্লে-স্টেশনে একটা যৌন উত্তেজক দৃশ্য দেখতে পেয়ে আমি খুব ভয় পেয়ে যাই। সারাটা রাত আমি ঘুমাতে পারিনি। বারবার মনে হচ্ছিল, আমি এটা কী দেখলাম! আমার খুব জানতে মন চায় কীভাবে এই গেইমগুলো আমাদের বাসাবাড়িতে ঢুকল? কীভাবেই বা প্রকাশ্য দিনেদুপুরে এসব দোকানপাটে বিক্রিও হচ্ছে?"

সবচেয়ে লজ্জার এবং চরম বিব্রতকর ব্যাপার হচ্ছে আমাদের ছেলেমেয়েরাই এইসব নগ্ন কিংবা অর্ধনগ্ন চরিত্রগুলোকে বাছাই করে নিচ্ছে স্বেচ্ছায়।

খেয়াল করলে দেখবেন যে এ সমস্ত গেইমগুলো খেলোয়াড়কে অনেকগুলো অপশন থেকে নিজের পছন্দমতো জিনিসগুলো বাছাই করে নেবার সুযোগ দেয়। তারা তাদের পছন্দের হিরোকেও সহজেই বাছাই করতে পারে। আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে প্রচুরসংখ্যক বাচ্চাকাচ্চাই তাদের খেলার মূল চরিত্র হিসেবে এইসব অর্ধনগ্ন নারীদের বেছে নিচ্ছে।

৩. নোংরামি এবং অশ্লীলতা।

কিছু গেইম আমাদের সন্তানদের কুৎসিত গালিগালাজ, মানুষকে অভিশাপ দেওয়া কিংবা অপমান করার পদ্ধতিগুলো শিখিয়ে দিচ্ছে। অথচ গেইমের সাথে গালিগালাজের কোনো সম্পর্কই নেই, সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে এসব কুৎসিত গালি গেইমেজুড়ে দেওয়া হয়। যেমন : দেখা যায় কারও কাছে কিছু চাইতে গিয়েও একটা নোংরা গালি দিয়ে কথা শুরু করা হচ্ছে। যেন বাচ্চাদের কাছে এসব নোংরা শব্দগুলোকে পরিচিত করে তোলাই এদের মূল উদ্দেশ্য।

কিছু কিছু গেইমের উপর লেখা থাকে "আরবি কপি"। কিন্তু দেখা যায় যে আরবি শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তা মূলত কাউকে অভিশাপ দেওয়া কিংবা গালিগালাজের কাজে ব্যবহার করা হয়।

অথচ কাউকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা,অভিশাপ দেওয়া, গালিগালাজ করা—এসব কখনোই একজন মুসলিমের কাজ হতে পারে না। রাসূল ﷺ বলেছেন :

> "একজন বিশ্বাসী সহজে অভিশাপ দেয় না, অন্যকে কষ্ট দেওয়া কিংবা অবমাননা করে না, কখনো নোংরামি কিংবা অশ্লীলতায় লিপ্ত হয় না।"[১৪]

কিছু কিছু গেইম আছে যেগুলো নাচ-গান শেখাবার জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা।

ভিডিও গেইমস খেলার প্রভাব

পূর্বের অধ্যায়ে ভিডিও গেইমসের যে বিষয়গুলো ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটাই ভিডিও গেইমসের সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক। আমাদের সন্তান-সন্ততির আচার-আচরণে এর বিশাল প্রভাব রয়েছে। ক্ষতির মাত্রায় কমবেশ থাকলেও আমাদের সন্তানরা এসব গেইমসের মাধ্যমে প্রভাবিত হচ্ছে।

অবশ্য এর বাইরে ভিডিও গেইমসের আরও কিছু নেতিবাচক দিক রয়েছে। যারা প্রচুর পরিমাণে ভিডিও গেইমস খেলে তাদের মাঝে এর প্রভাবগুলো দেখা যায়। ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিকতার বিষয়টা যদিও অনেকে হালকাভাবে নিতে পারে, কিন্তু এই প্রভাবগুলোর ভয়ংকর দিক ঠিকই চোখে পড়বে।

এ নেতিবাচক প্রভাবগুলো মূলত ৩ ধরনের :

১) এগুলো বিশেষভাবে মুসলিম পরিবারের সন্তানদের প্রভাবিত করে। এসব গেইমসের কারণে ধর্মীয় কর্তব্য পালনে শিথিলতা চলে আসে। অনেক সময় অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

২) সামাজিক নীতি-নৈতিকতার উপর এসব গেইমস ভয়ংকর প্রভাব ফেলে। আর এসব ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে মুসলিম সমাজের চিন্তাশীলরা তো বটেই, সেক্যুলার ঘরানার সচেতন ব্যক্তিরাও প্রায় সময় কথা বলে থাকেন।

৩) এসব গেইমস সামগ্রিকভাবে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক, দৈহিক কিংবা অর্থনৈতিক দিকগুলোকেও প্রভাবিত করে থাকে।

১. ধর্মীয় কর্তব্য পালনে নেতিবাচক প্রভাব।

প্রথমত, নামাজ ছুটে যাওয়া

গেইমগুলো এতই আকর্ষণীয়ভাবে সাজানো থাকে যে খেলোয়াড়েরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা এর সামনে বসে থাকতে পারে। প্রত্যেক ধাপ পার করার সাথে সাথে তারা

---

[১৪] *আহমাদ*: ৩৯৪৮; আল আরনাউত একে সহীহ বলেছেন।

নতুন ধাপে পৌঁছায়, যা আগের ধাপের চেয়ে আরও বেশি আকর্ষণীয় এবং রোমাঞ্চকর।

এসব কারণে গেইম ছেড়ে ওঠা তাদের জন্য খুব কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি নামাজের সময় চলে যেতে থাকে তারপরেও তারা খেলা বন্ধ করে না। অনেকে প্রায়ই ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেলে নামাজ পড়তে যায়। শেষ পরিণতি হিসেবে অনেকে নামাজই ছেড়ে দেয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ,

> **"তাদের পরে এল এমন এক অসৎ বংশধর, যারা সালাত বিনষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং শীঘ্রই তারা জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।"**[১৫]

দ্বিতীয়ত, পিতামাতার অবাধ্যতা

অনেক ছেলেমেয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনকি সারাটা দিন ভিডিও গেইমস নিয়ে কাটিয়ে দেয়। এরা মানুষজন দেখলে এড়িয়ে চলে, কারও সাথে মিশতে চায় না। ভিডিও গেইমস নিয়ে পড়ে থাকতেই এরা বেশি মজা পায়। এর ফলে ধীরে ধীরে তারা তাদের বাবা-মায়ের অবাধ্য হয়, তাদের কথা শুনতে চায় না। কারণ, বাবা-মায়ের কথা শুনলে তো এসব গেইমস ছেড়ে দিতে হবে—যা তারা কল্পনাও করতে পারে না।

> অবাধ্যতার মাত্রা শুধু আদেশ না মানায় সীমাবদ্ধ না থেকে অনেকদূর গড়াতে পারে। ইসলামের একজন দায়ী বলেন : "১৩ বছর বয়সী এক ছেলের পিতা আমাকে ফোন দেন। গেইম খেলতে খেলতে তার ছেলের হাতে খিঁচুনির মতো হয়ে যেত। এমনটা যখনই ঘটত তার ছেলের উগ্রতা আরও বেড়ে যেত। এমনকি সে সময় তার মা পাশে থাকলে অনেক সময় মায়ের গায়েও হাত তুলত। এই ঘটনার পর খোঁজখবর নিয়ে জানা জানা গেল এই ছেলে দৈনিক ৫ ঘণ্টা করে প্লে-স্টেশনে ভিডিও গেইমস খেলে।[১৬]

---

[১৫] সূরাহ মারইয়াম, ১৯ : ৫৯

[১৬] 'ভিডিও গেইমস : বিপদ এবং বিকল্প'- খালিদ আল হুলাইবি; লিংক : Link: http://saaid.net/tarbiah/১৫৭.htm

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

"আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের 'উফ' বোলো না এবং তাদের ধমক দিয়ো না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো। আর তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বলো, 'হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন।'"[১৭]

তৃতীয়ত, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা

একজন শিশু বা কিশোর যদি তার অবসর সময়ের পুরোটুকুই এই সমস্ত গেইমসের পেছনে ব্যয় করে, তাহলে সে আত্মীয়তার সম্পর্কগুলো বজার রাখার সময় পাবে কীভাবে? কখন সে তার দাদা-দাদি, নানা-নানি, ভাই-বোন, চাচা-মামাদের সাথে দেখা করবে? বরং এর উল্টোটাই ঘটে থাকে। সত্যি কথা বলতে এসব গেইম প্রায়ই ভাই-বোনদের মধ্যে পারিবারিক কলহের সূত্রপাত করে।

একবার তো গেইম খেলার কারণে এক ছেলেকে তাঁর বাবা ঘর থেকেই বের করে দিয়েছে। *আল ওয়াতান* নামক একটি দৈনিক পত্রিকায় খবরটা আসে। এক লোকের দুই ছেলে, একজনের বয়স ২ অন্যজনের ৮। তারা প্লে-স্টেশনে একটি ফুটবল গেইম খেলত। ছোট ভাইয়ের চেয়ে বড় ভাই কিছুটা ভালো খেলোয়াড় ছিল।

বাবা চাইলেন ছোট ছেলেটিকে একটু খুশি করতে। তাই বড় ভাইকে বললেন সে যেন ছোট ভাইকে ইচ্ছে করেই খেলায় জিতিয়ে দেয়। কিন্তু ছোট ভাই যখন একটি গোল দিয়ে ফেলল তখন বড় ভাইয়ের মাথা গরম হয়ে গেল এবং সাথে সাথে একটি গোল করে সে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনল। এর কিছুক্ষণ পর আরেকটি গোল করল। শেষ পর্যন্ত বড় ভাই খেলায় জয়ী হলো।

খেলায় হেরে ছোট ভাই কান্না জুড়ে দিলো। কান্না শুনে তাদের বাবা গেলেন রেগে। রাগের চোটে তিনি গেইম খেলার জিনিসপত্র ভাঙলেন তো ভাঙলেনই, বড় ছেলেকে ঘর থেকেও বের করে দিলেন। বড় ছেলে কিছুদিন চাচার বাসায় থাকল। বাসায় আর কোনো দিন প্লে-স্টেশন আনা যাবে না, আনলে ভয়াবহ পরিণতি হবে—এই শর্তে পরে অবশ্য বাবা তাকে বাড়ি আসার অনুমতি দেন।,[১৮]

---

[১৭] সূরাহ বানী ইসরাঈল, ১৭ : ২৩-২৪

[১৮] ('ভিডিও গেইমস : বিপদ এবং বিকল্প'-খালিদ আল হুলাইবি; লিংক : Link: http://saaid.net/tarbiah/157.htm)

জনৈক ব্যক্তি বলেন, "আমাদের বাড়ির কিছু ছেলেমেয়ে মাঝেমধ্যেই তাদের কোনো একজনের বাড়িতে জড়ো হতো গেইমস গেলার জন্য। সেখানে নিয়ম থাকে সবাই একবার করে খেলার সুযোগ পাবে। নিয়ম অনুযায়ী তারা তাদের সিরিয়াল সাজিয়ে নিত।

প্রথমজন এসে ১৫ মিনিট খেলল। এরপর দ্বিতীয়জনের পালা। কিন্তু সে ৩০ মিনিট ধরে খেলে গেল। তৃতীয় খেলোয়াড় যখন এটা নিয়ে অভিযোগ করল দ্বিতীয় খেলোয়াড় গায়ের জোরে তার মুখ বন্ধ করালো। এবার দ্বিতীয়জনের পালা শেষ হবার পর তৃতীয়জন চাইলো আরও লম্বা সময় ধরে অন্য একটি গেইম খেলতে। তার উদ্দেশ্য কিন্তু দ্বিতীয়জনকে একটু বিরক্ত করা। এটা নিয়ে দুইজনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া আর মারামারি শুরু হয়ে গেল। এমনকি দুজনের মা-ও এতে জড়িয়ে গেল এবং তারা তাদের নিজ নিজ সন্তানের পক্ষ নিয়ে তর্কাতর্কি শুরু করল। শেষে বাচ্চাদের ভিডিও গেইমসের সমস্যা বড়দের পর্যন্ত গড়াল। দীর্ঘদিন যাবৎ তারা একে অপরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে রেখেছিল।"

এভাবেই এই গেইমগুলো পারিবারিক এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব গেইম কীভাবে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক নষ্ট করছে, পিতার সাথে সন্তানের, ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের কলহ বাধিয়ে দিচ্ছে—চাইলে এসব নিয়ে আলোচনা আরও দীর্ঘ করা যায়।

চতুর্থত, স্ত্রীর অধিকারের ব্যাপারে অসচেতনতা

ভিডিও গেইমসের এই বিষফোড়া শিশু-কিশোরদের ছাড়িয়ে বড়দের মাঝেও ছড়িয়েছে। এর পেছনে সময় দিতে গিয়ে যুবক পুরুষরা স্ত্রীর অধিকারের ব্যাপারে অসচেতন থাকে। অনেক স্ত্রীরই অভিযোগ যে তাদের স্বামীরা এসব গেইম নিয়ে প্রায়ই ব্যস্ত থাকে। এমন ঘটনাও আছে যে স্ত্রীরা তাদের স্বামীর কাছে তালাক চেয়েছেন, কারণ স্বামীর আচরণ তাদের সহ্যসীমার বাইরে চলে গেছে। তাদের স্বামীরা গেইম নিয়ে এতটাই ব্যস্ত যে তাদের স্ত্রীদের কথা অনেক সময় মাথায়ই থাকে না।

হে আল্লাহ, তুমিই তো অন্তরের স্থিতিশীলতা দানকারী, তুমি আমাদের অন্তরকে স্থিতিশীল করে দাও।

পঞ্চমত, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি এবং সমস্যার সৃষ্টি করা

যারা বন্ধুবান্ধবদের সাথে সাইবার ক্যাফেতে এসব গেইম খেলে তারা জেনে থাকবে যে, এসব গেইমের মধ্যে এমন কিছু গেইমও আছে যা বাচ্চাদের মধ্যে বদরাগ এবং উত্তেজনা তৈরি করে। এমনও হয়েছে যে গেইম খেলা শেষ হবার পর ঝগড়া করে অনেকে বন্ধুত্বের সম্পর্ক পর্যন্ত ছিন্ন করেছে। শুরুতে কেবল মজা করার জন্য কিংবা অবসর সময় কাটানোর জন্য এসব গেইম খেলা শুরু হলেও ধীরে ধীরে এটি প্রতিযোগিতায় রূপ নিয়েছে, যা তৈরি করছে নানান বিশৃঙ্খলা আর পরস্পরের মধ্যে অহেতুক ঝগড়াঝাঁটি।

ইসলাম যে ভ্রাতৃত্ববোধের সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য আমাদের আদেশ দেয় এই সমস্ত গেইমস সেই ভ্রাতৃত্ববোধকেই নষ্ট করে দিচ্ছে।

> আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ﵁ থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। তারা একে অপরের উপর জুলুম করে না। যে তাঁর ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসে আল্লাহ তার সাহায্যে এগিয়ে আসবেন।"[১৯]

একইভাবে প্রতিযোগীদের মাঝে এসব গেইম খেলা নিয়ে যে নোংরামি, একে অপরকে অভিশাপ দেওয়া কিংবা একগুঁয়ে আচরণ—এ সবকিছুই মুসলমানদের পারস্পরিক সম্প্রীতি নষ্ট করার পেছনে দায়ী।

ষষ্ঠত, হারাম কাজকে হালকাভাবে নেওয়ার অভ্যাস তৈরি হওয়া

১) জুয়া

তরুণদের মাঝে জুয়া খেলার ব্যাপকতার পেছনে অন্যতম কারণ ভিডিও গেইম। দুইজন খেলোয়াড় একত্রে কোনো খেলায় অংশ নেয়। জুয়ার শর্ত থাকে, যে পরাজিত হবে তাকে দুজনেরই গেইম খেলার বিল পরিশোধ করতে হবে। অথবা খাবার বা চা-নাস্তা করানোর শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়। একজন নিয়মিত পেশাদার খেলোয়াড় জানান, "এই গেইমগুলো তরুণদের মাঝে অনেক ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করে। বিশেষভাবে ফুটবল গেইমগুলোর। ক্যাফেতে বসেই একজন

---

[১৯] *বুখারি*: ২৩১০ এবং *মুসলিম*: ২৫৮০

আরেকজনের সাথে কে জিতবে তা নিয়ে বাজি ধরে। কখনো কখনো পরাজিত ব্যক্তিকে খাবার বা চা-নাস্তার বিল দিতে বাধ্য করা হয়।”

একজন বাবা জানান,

> “কাজে যাবার পথে একটা দোকানের সামনে আমি বাচ্চাকাচ্চাদের একটা ভিড় দেখতে পেলাম। তারা সেখানে কী করছে আমার জানতে ইচ্ছে হলো। তাই তাদের জিজ্ঞেস করলাম। তারা একটা প্লে-স্টেশনের চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল। একটা বাচ্চার কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম, ‘গেইম খেলার টাকা কে দেবে?’ আমাকে অবাক করে দিয়ে সে জানাল, ‘এটা খেলোয়াড়ের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে।’ বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম , ‘কীভাবে?’ সে বলল, ‘যে খেলায় হারবে সে টাকা দেবে!’”

অথচ শরিয়তের দৃষ্টিতে এটা হারাম জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। এসব গেইম খেলার ফলে ছেলেমেয়েরা ধীরে ধীরে প্রতারণার নানা কৌশল শিখছে। এমনকি তারা তাদের বাবা-মাদেরও প্রতারিত করার চেষ্টা করে। এই গেইমগুলো খুব অল্প বয়স থেকেই বাচ্চাকাচ্চাদের এ সমস্ত ঘৃণ্য কাজকর্মে অভ্যস্ত করে ফেলছে।

২) গান-বাজনা শোনা

এমন কোনো গেইম পাবেন না যেখানে গান-বাজনার সামান্য অংশ থাকে না। গেইমের কোনো কোনো ধাপে অবশ্যই কিছু না-কিছু থাকবেই। অথচ এটা তো কারও অজানা নয় যে, ইসলামে বাদ্য-বাজনা হারাম। কারণ, বাদ্য-বাজনা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ এবং তার কিতাব থেকে দূরে সরিয়ে ফেলে। আর বাদ্য-বাজনার সাথে যদি আজেবাজে কথা, কাজ, ইঙ্গিত এবং কানফাটানো উচ্চৈঃস্বর যুক্ত হয় তবে তো কথাই নেই। গেইম খেলার সময় দীর্ঘক্ষণ মিউজিকের মধ্যে থাকলে এর প্রতি দুর্বলতা তৈরি হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর এই দুর্বলতা শেষে মিউজিকের সাথে একটা গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক তৈরি করে ফেলতে পারে।

২. সুন্দর চরিত্রের প্রতি হুমকি

এই বিষয়টা নিয়ে মুসলিমরা তো বটেই পাশ্চাত্যের সচেতন সমাজও চিন্তিত। কারণ, তারা তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভালো-খারাপ, তাদের সার্বিক নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতা নিয়ে যথেষ্ট সচেতন।

এ রকম কিছু প্রভাবের কথা নিচে উল্লেখ করা হলো :

৬. চুরি, সন্ত্রাস ইত্যাদি শেখানো এবং এসবের কারণে সৃষ্ট দাঙ্গা-হাঙ্গামা

কিছু গেইমের গল্পে এমন কোনো মিশন থাকে যেখানে খেলোয়াড়দের দায়িত্ব হলো কোনো বিশেষ গ্যাং এর কাউকে হত্যা করা, কোনো আর্মি ক্যাম্প থেকে অস্ত্রশস্ত্র চুরি করা, ট্রেন অথবা ট্রাকে ডাকাতি করে সব লুটপাট করা ইত্যাদি।

আজকের সমাজে হিংস্রতা আর অমানবিকতার এই চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধির জন্য এসব গেইমই দায়ী।

> গবেষকরা বলছেন যে, মর্টাল কম্ব্যাটের মতো আগ্রাসী ধরনের গেইমগুলো হিংস্রতা এবং উন্মাদনাকে উসকে দেয়। তারা আরও বলছেন যে, এই ধরনের গেইমগুলো বিভিন্ন টিভি শোতে দেখানো আগ্রাসী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর। কারণ, গেইমগুলোতে খেলোয়াড় নিজে অংশ নেওয়ার একটা অনুভূতি পায়। অংশ নিয়ে সে নিজেই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে কিংবা গেইমের অন্য চরিত্রগুলোকে সহায়তা করে। ফলে এ মজাটা সে নিজের সত্তার মধ্যে অনুভব করতে থাকে।[২০]

ভিডিও গেইমসের সাথে সামাজিক বিশৃঙ্খলার সম্পর্ক নিয়ে যেসব গবেষণা হয়েছে সেখানে দেখা গেছে, ভিডিও গেইমগুলো শিশু-কিশোরদের আচরণকে লাগামহীন করে তুলছে। বিশ বছর ধরে চালানো এক গবেষণায় দেখা গেছে, এই নেতিবাচক প্রভাবগুলো তাৎক্ষণিক এবং দীর্ঘস্থায়ী উভয় ধরনেরই হতে পারে।

একটা গবেষণার কথা দেখা যাক। আগ্রাসী গোছের একটা ভিডিও গেইম দশ মিনিটের কম খেলার পর কিছু বাচ্চার আচরণ পর্যবেক্ষণ করা হয়। দেখা যায় এই অল্প সময় গেইমটি খেলে তারাও কিছুটা আক্রমণাত্মক আচরণ শুরু করেছে।[২১]

> ১৩-১৫ বছর বয়সী কিছু কিশোরদের উপর একটা গবেষণা চালানো হয়। এতে দেখা যায় এই ধরনের আক্রমণাত্মক ধাঁচের গেইম খেলা ছেলেমেয়েরা অন্যান্যদের চেয়ে একটু বেশিই বেয়াদব প্রকৃতির হয়ে থাকে। এবং তারা অন্যদের সাথে ঝগড়া বাধিয়ে দিতেও সিদ্ধহস্ত। আমেরিকান সাইকোলিজিকাল অ্যাসোসিয়েশনের বাৎসরিক সভায় একটা গবেষণার

[২০] আমেরিকান সাইকোলোজিকাল অ্যাসোসিয়েশনের একটি ম্যাগাজিনে গবেষণাটি প্রকাশিত হয়। বিবিসি অনলাইন এটিকে ২৪/৪/২০০০ সালে প্রকাশ করে।

[২১] (Link:http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=৩১&issue=৯৭৬৩&article=৩১৮৭৬০)

ফলাফল প্রকাশিত হয়। সেখানে একটা প্রস্তাবনা এমন ছিল যে, শিশু-কিশোরেরা যে গেইমগুলো খেলে সেগুলোতে আগ্রাসী গোছের বিষয়গুলো যেন ব্যাপক আকারে কমিয়ে আনা হয়। এ গেইমগুলো সম্বন্ধে সতর্ক করার অংশ হিসেবে এই সভা সকল অভিভাবক, শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্টদের কাছে সহযোগিতাও কামনা করে।[২২]

ড. আব্বাস আব্দুস সালাম বলেন, "এসব গেইম খেলে বাচ্চারা খুব সহজেই আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে বড় হয় এবং বিশৃঙ্খলা, দুর্ধর্ষ আচরণ, লুটপাট এসবের প্রতি তাদের ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।" এর কারণ হলো বাচ্চারা চায় তারাও যেন গেইমের চরিত্রগুলোর মতো হতে পারে। আর এসব গেইমের অধিকাংশ জুড়েই থাকে মারধর, হত্যাযজ্ঞ কিংবা আগ্রাসী আচরণ; এসব গেইম যারা খেলে বা দেখে স্বভাবতই তারা চাইবে এসব অনুকরণ করতে।

অনেক বাবাই তাদের বাচ্চাদের আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে চিন্তিত থাকেন। তাদের এই দুশ্চিন্তার পেছনে আরেকটি মূল কারণ হলো পরিবারের ভাইবোনদের সাথে গেইমখেলুড়ে বাচ্চার আগ্রাসী আচরণ। প্রায়ই এমন হয় যে, ভাইবোনদের সাথে তারা খুব রুক্ষ মেজাজ দেখায় এবং মাঝেমধ্যে মারধর করে আর পাগলের মতো আচরণ করে।

এ সবকিছুর পেছনে রয়েছে গেইমে দেখা আগ্রাসী চরিত্রগুলোর অনুসরণ, অনুকরণ। যেমন : গাড়ি প্রতিযোগিতার রেসিং গেইমগুলোতে ড্রাইভারেরা যেমন উন্মাদের মতো গাড়ি চালিয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার হয় এরাও এসবের অনুকরণ করতে চায়।

এভাবে খুব সহজেই আমাদের সন্তানেরা এ সমস্ত বিধ্বংসী গেইমের সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছে। তারা ধীরে ধীরে সন্ত্রাসী কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ পাচ্ছে। বাচ্চারা টিভির পর্দায় মুভিতে যা কিছু দেখে তা দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয় এবং তারা সেগুলোকে অনুকরণের চেষ্টা করে। এমনকি ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যার মতো জঘন্য দৃশ্য কিংবা অবৈধ যৌনমিলন, ধূমপান এসবের মতো নোংরা এবং জঘন্য কাজগুলোকেও তারা অনুকরণের চেষ্টা করে। তাহলে সচেতন সমাজের কাছে এই সব গেইমগুলো নিয়ে প্রশ্ন রয়েই গেল। আপনাদের কোমলমতি বাচ্চারা যে এ রকম বিধ্বংসী গেইমে অংশ নিচ্ছে, তাদের ব্যাপারে আপনারা কতটা চিন্তিত? আপনার বাচ্চা গেইমে জয় লাভ করার জন্য পাগলের মতো খেলে যাচ্ছে, আর খেলায় তার সাফল্য নির্ভর করছে সন্ত্রাস এবং লুটপাটে অংশ নেওয়ার মাধ্যমে।

---

[২২] *মাজাল্লাত আল ইসলাম আল ইয়াওম*, ১৪তম সংস্করণ, যুল হিজ্জাহ, ১৪২৬ হিজরি, পৃ. ৫০

এইসব গেইমের শিকড় যে কতদূর পৌঁছে যায় এবং কতশত ভীতিকর ঘটনার জন্ম দেয় তা বুঝতে জার্মানির একটা ঘটনা আমাদের সাহায্য করবে। একবার এক ১৮ বছর বয়সী তরুণ হুট করে এক স্কুলে এসে এলোপাতাড়ি গুলি করে প্রায় ১১ জন স্কুল ছাত্রকে হত্যা কিংবা আহত করে। এ জঘন্য ঘটনা ঘটাবার পর সে নিজেও আত্মহত্যা করে। স্থানীয় এক গণমাধ্যমের মতে এই তরুণ কাউন্টার স্ট্রাইক নামক এক গেইমে প্রচণ্ড রকম আসক্ত ছিল। এই গেইমের একটা মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে এলিয়েনদের হত্যা করা। এই ঘটনার পর একটা জরিপ চালানো হয়। জরিপে দেখা যায় ৭২ শতাংশ মানুষ মনে করে এই ধরনের ঘটনার সাথে সরাসরি ভিডিও গেইমের সম্পর্ক রয়েছে।[২৩]

আমাদের সমাজেও এসবের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে প্লে-স্টেশনে ফুটবল খেলা নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে তর্ক বাধে। শেষ পর্যন্ত এ তর্ক এতদূর গড়ায় যে, বড় ভাই তার ছোট ভাইকে প্রায় মারতে উদ্যত হয় এবং ছুরি হাতে নিয়ে হুমকি দেয়। এই ঘটনার জের ধরে দুই ভাইয়ের মা প্রচণ্ড রকম মানসিক পীড়ায় ভুগতে শুরু করেন।

তার ভাষায়,

"আমি কখনোই ভাবতে পারিনি, আমার ১০ বছর বয়সের ছেলে সামি ৮ বছর বয়সী ছোট ভাই ফাহাদকে শুধু একটা গেইম খেলাকে কেন্দ্র করে ছুরি হাতে হুমকি দিতে পারে। হঠাৎ আমি ছোট ছেলে ফাহাদের আর্তচিৎকার শুনতে পাই। রুমে ঢুকে যা দেখলাম তা দেখার পর থেকে আমি ঠিকমতো ঘুমাতে পারতাম না। দেখলাম তার ঘাড়ের উপর ছুরি ধরে তার ভাই তাকে হুমকি দিচ্ছে।"[২৪]

যারা এরপরেও ভিডিও গেইমসের প্রভাবকে হেসেই উড়িয়ে দিতে চান তাদের জন্য নিচের ঘটনাটি দেওয়া হলো :

১০ বছরের এক সৌদি বালক প্লে-স্টেশনের একটি গেইমে খেলত। বাস্তব জীবনে সেটি নকল করতে গিয়ে শ্বাসরোধ হয়ে মারা যায়। তার বাবা

[২৩] (Link: http://syria-news.com/var/articlem.php?id=৭৪৬)

[২৪] আল ওয়াতান পত্রিকা, ২৩৫৯তম সংখ্যা, শুক্রবার, ২৬ সফর, ১৪২৮ হিজরি। শিরোনাম ছিল, "প্লে-স্টেশন খেলা নিয়ে ঝগড়া ভাইকে ছুরি নিয়ে হুমকি দেওয়াতে গড়াল"; Link: http://www.alwatan.com.sa/daily/২০০৭-০৩-১৬/socity/socity০৫.htm

এমনটিই জানান। তিনি আরও জানান, তাঁর ছেলের কোনো মানসিক সমস্যা ছিল না; বরং সে পড়াশোনায় মনোযোগী এবং মেধাবী ছিল।[২৫]

২. বাচ্চাদের মধ্যে স্বার্থপরতার বীজবপন

এই গেইমগুলো বাচ্চাদের স্বার্থপর বানিয়ে দেয়। এগুলো শেখায় কীভাবে সবকিছুকে বাদ দিয়ে কেবল নিজে আনন্দ উপভোগ করবে । এগুলো প্রতিনিয়ত পারিবারিক পরিমণ্ডলে সমস্যার সৃষ্টি করে। ভাইবোনদের মধ্যে কে আগে খেলবে কে পরে এসব নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া বাধে। পাড়া মহল্লায় দলবেঁধে যে খেলাগুলো খেলা হয় সেগুলোর সম্পূর্ণ বিপরীত। পাড়া-মহল্লার খেলাগুলোতে দেখা যায় উল্টো খেলার জন্য বন্ধুবান্ধবদের ডেকে আনা হয়।

৩. খেলোয়াড়দের মাঝে আত্মকেন্দ্রিকতার বিস্তার

এইসব গেইম খুব সহজেই একা একা ঘরে বসে খেলা যায়। বাচ্চারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বন্ধুবান্ধব ছাড়া এইসব নিয়েই পড়ে থাকে। আসলে এইসব গেইম ধীরে ধীরে বাচ্চাদের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা, অন্তর্মুখী স্বভাবের জন্ম দেয়। তা ছাড়া মিলেমিশে কাজ করার অভ্যাসটিও তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে না। বরং মাঝেমধ্যে অন্যের উপস্থিতি তাদের ভালো লাগে না।

দেখা যায় বাচ্চাটি কারও সাথে কোনো যোগাযোগবিহীন অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছে। এর ফসল হচ্ছে এমন একটি বাচ্চা যে একাধারে অন্তর্মুখী এবং অসামাজিক। সামাজিক পরিমণ্ডলে তাদের নিয়ে আসা হলে দেখা যায় লোকের সাথে কীভাবে মিশতে হয় তা তারা জানে না। সামাজিকতা তারা শিখবে কোত্থেকে? সমাজের সাথে মিশলে তবেই না তারা সামাজিকতার শিক্ষাটা পেত।

পাড়া-মহল্লার মাঠে-ময়দানে খেলা গেইমের সাথে এগুলো আপাদমস্তক সাংঘর্ষিক। পাড়া-মহল্লার গেইমগুলো মানুষের সাথে মেশার যে ক্ষমতা তার বিকাশে একজন শিশুকে সহায়তা করে। বাচ্চারা ধীরে ধীরে অনেক সামাজিক আচার-আচরণ ও দায়িত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে, যেগুলো কিনা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য খুবই জরুরি। তাদের মাঝেই তো লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের বাবা-মা কিংবা শিক্ষকেরা।

মাঠে-ময়দানের অধিকাংশ খেলাতেই দুইয়ের অধিক খেলোয়াড় প্রয়োজন হয়। এই খেলাগুলো বন্ধুবান্ধবদের সাথে সরাসরি সুস্থ প্রতিযোগিতার বিষয়গুলো শেখায়।

[২৫] *আল ওয়াতান* পত্রিকা ৬.০৩.২০০৬ খ্রি.

অন্যদিকে ভিডিও গেইমগুলো শেখায় কীভাবে ঘরের কোনায় বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার করা যায় কিংবা কীভাবে অন্তর্মুখী হওয়া যায়।

একটা গবেষণায় দেখা গিয়েছে যেসব বাচ্চারা প্রযুক্তি কিংবা কম্পিউটার গেইমসের গতিশীল জীবনের সাথে অভ্যস্ত তারা দৈনন্দিন ধীরস্থির জীবনে খুব অস্বাভাবিক অনুভব করে। এই অনুভূতিটা ধীরে ধীরে শিশুদের মনস্তাত্ত্বিকভাবে শূন্যতায় ফেলে দেয় এবং তারা একাকিত্ব অনুভব করতে থাকে।

৪. কল্পনার জগতে বসবাস

ভিডিও গেইমসের জগৎ যে সকল কাল্পনিক দৃশ্যাবলি নিয়ে গঠিত তা খেলোয়ারদের এক কল্পনার সাগরে ভাসিয়ে বেড়ায়। ভিডিও গেইমসের ক্ষতিকর দিকগুলোর মধ্যে এটাও অন্যতম। বিশেষ করে তাদের জন্য যারা দুর্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী কিংবা যারা বাস্তব দুনিয়া থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন।

ইবনুল কায়্যিম ﷺ বলেন,

> "সেই সব লোক যারা আত্মপ্রত্যয়ের ব্যাপারে খুব দুর্বল এবং আত্মিক ও রুহানি দিক থেকে খুবই নীচু প্রকৃতির তারাই খুশি থাকে মিথ্যা এবং অলীক জিনিস নিয়ে। এই মিথ্যা প্রেরণাগুলোকে তারা কাছে টেনে নেয় এবং এসব দিয়েই নিজেদের জীবনকে সাজায়। আল্লাহর শপথ, এসবই হচ্ছে নিঃস্ব পথহারা মানুষদের কাছে আসল বিষয় অথচ এগুলোই একজন ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর জিনিস। পবিত্র, সম্মানিত এবং উচ্চমার্গে আসীন আত্মা তো কেবল সেগুলোই যেগুলো প্রতিটি অসার চিন্তা এবং কর্মকে আস্তাকুঁড়ে ছুড়ে ফেলে তার কাছে যেগুলোর কোনো মূল্যই নেই। এই আত্মাগুলো সন্তুষ্টচিত্তে সকল বাজে চিন্তাকে তাদের মন থেকে দূরে রাখে। এই আত্মাগুলো কোনো বাজে চিন্তা তাদের গ্রাস করুক তা খুবই অপছন্দ করে।"[২৬]

৩. সাধারণ আচরণগত প্রভাব

মুসলিম-অমুসলিমনির্বিশেষে সকলেই এসব গেইমের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্বন্ধে কথা বলছেন। কারণ, এই গেইমগুলো অনেক দুনিয়াবি অর্জনের পথেও বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এসব ক্ষতিকর দিক মানুষের মনস্তাত্ত্বিক, স্বাস্থ্যগত দিক কিংবা সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলোকেও প্রভাবিত করে।

---

[২৬] আদ দ্বাউ ওয়াদ দাওয়া : ১০৭-১০৮ পৃ.

প্রথম প্রভাব : সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানগত প্রভাব

সাংস্কৃতিক কিংবা জ্ঞানগত দক্ষতা অর্জনের পথে ভিডিও গেইমস বড়সড় এক অন্তরায়। বাচ্চারা যখন ভিডিও গেইমসে মাত্রাতিরিক্ত আসক্ত হয়ে পড়ে তখন তাদের পড়াশোনায়ও ক্ষতি হয়। দেখা যায় তারা প্রচুর সময় নষ্ট করার কারণে পড়া রিভিশন দিতে পারে না। গেইম খেলতে খেলতে অনেক সময় তারা ক্লান্তও হয়ে পড়ে, যা সময়ের বৃথা অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব অনেক সময় তাদের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের সম্ভাবনাগুলোকে গলা টিপে হত্যা করে ফেলে। অনেক কিশোরেরা পড়াশোনা ফেলে গেইম খেলতে চলে যায় অথচ তাদের অবহেলার বিষয়টা তাদের পরিবারের সদস্যদের অজান্তেই থেকে যায় ।

অনেক শিক্ষাবিদ এবং উপদেষ্টারা সাম্প্রতিক সময়ে ক্লাসরুমে ঘুমানো কিংবা দেরিতে ক্লাসে আসার বিষয়টি লক্ষ করছেন। আমরা কিছু কলেজ ছাত্রের ব্যাপারে শুনেছি যারা নির্ধারিত সময়ের দ্বিগুণ সময় লাগিয়ে পাশ করেছে। আর এসবের পেছনে ছিল ভিডিও গেইমস এবং এ-জাতীয় বদ অভ্যাসের প্রভাব। এমনটা চলতে থাকলে পরিণামে তাদের মাঝে বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বলতা তৈরি হতে পারে।

দ্বিতীয় প্রভাব : স্বাস্থ্যগত সমস্যা

ভিডিও গেইমসের পর্দার সামনে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকলে যে অনেক ধরনের সমস্যা হতে পারে এতে কারও সন্দেহ নেই। যেমন :

১) বাজে স্বাস্থ্য, আলস্য এবং মোটা হয়ে যাওয়া

দেখা যায় এসব গেইমের সামনে বসে আমাদের বাচ্চারা কোথাও না গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার করে দিচ্ছে। একেবারে নট নড়ন নট চড়ন অবস্থা। এর ফলে তাদের শরীরের পেশিগুলোতে আড়ষ্টতা এবং ঝিমুনি তৈরি হয়। একটা গবেষণায় দেখা গিয়েছে বিশ্বের অধিকাংশ দেশে সাম্প্রতিক সময়ে যে স্থূলতা বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে তার মূলে রয়েছে টেলিভিশন বা কম্পিউটারের সামনে লম্বা সময় বসে থাকা।

নয় থেকে উনিশ বছরের ২,০০০ ছাত্রের মধ্যে গবেষণা করে দেখা গিয়েছে তাদের ওজন ৫৪ কেজি থেকে ৬০ কেজিতে পৌঁছেছে। ফিটনেসজনিত সমস্যাও লক্ষ করা গিয়েছে। আরও দেখা গিয়েছে ১৯৮৫ সালের দিকে ১০ বছরের বাচ্চারা ১.৬ কিলোমিটার রাস্তা দৌড়াতে ৮.১৪ মিনিটের বেশি নিত না। কিন্তু বর্তমান সময়ে একই দূরত্ব অতিক্রম করতে তাদের ১০ মিনিট বা তারও বেশি লাগছে।[২৭]

---

[২৭] *আত তিফল আল মুতামাইয়্যিয়াহ*, ২৩তম সংখ্যা, যুল ক্বাদা, ১৪২৫ হিজরি

আমরা যদি আমাদের আশেপাশের রাস্তাঘাটগুলো নিয়ে একটু ভাবি, তাহলে এখনকার রাস্তা এবং ৫ বছর আগের রাস্তার মধ্যে বড়সড় একটা পার্থক্য খুঁজে পাব।

আগে দেখা যেত বাচ্চারা রাস্তাঘাটে কিংবা মাঠে-ময়দানে দাবড়ে বেড়াচ্ছে। হয় ফুটবল খেলছে নয়তো দৌড় লাগাচ্ছে কিংবা বন্ধুবান্ধবেরা মিলে একসাথে খুনসুটি করেও মজা পাচ্ছে।

কিন্তু আজকালকার সময়ে তাকালে দেখবেন রাস্তা কিংবা মাঠ-ময়দানগুলো অনেকটাই খালি।

রাস্তাঘাটে হাঁটলে দুই দল দুরন্ত কিশোর ফুটবল খেলছে এমনটা খুব কমই চোখে পড়বে। অথচ এই খেলাটা খেলতে বড়জোর এক ঘণ্টা লাগে, এরপর সবাই বাসায় চলে আসে। তাহলে কারণটা কী? কেন আমাদের বাচ্চারা এসব খেলার প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে? কারণ, আমাদের বাচ্চারা আজকাল শারীরিক পরিশ্রম হয় এবং বন্ধুদের সাথে খেলা যায় এমন সব খেলার পরিবর্তে প্লে-স্টেশনকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

এসব কারণে আমাদের সন্তানদের মাঝে স্থূলতা এবং শারীরিক দুর্বলতা দেখা দিচ্ছে।

২) পেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া

অনেক বাচ্চারাই ইদানীং ঘাড়ে ব্যথার কথা বলছে। বিশেষ করে ডানহাতিদের ক্ষেত্রে এটা ঘাড়ের বাম পাশে দেখা দিচ্ছে। আর যারা বামহাতি তাদের ঘাড়ের ডান পাশে এ ধরনের ব্যথা অনুভূত হচ্ছে। আমরা জানি গেইম খেলার সময় একটু পরপরেই দ্রুততার সাথে হাতে বিভিন্ন কাজ করতে হয়। এর ফলে ঘাড় এবং আশেপাশের পেশিতে প্রতিনিয়ত টান পড়ে। তা ছাড়া গেইম খেলার সময় বসার পদ্ধতিটি সব সময় শরীরের জন্য উপযুক্ত হয় না। এসব কারণেই বাচ্চারা এই সমস্যাগুলো অনুভব করছে।

৩) ক্ষতিকর বিকিরণের প্রভাবে দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা

বাচ্চারা যখন লম্বা সময় ধরে ভিডিও গেইমসের পর্দার সামনে বসে থাকে তখন তারা সারাক্ষণই ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তড়িতচৌম্বক বিকিরণের মুখোমুখি হয়। এ কারণে বাচ্চাদের দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা সৃষ্টি হচ্ছে। (আইন আশ শামস ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. ইলহাম মুহাম্মাদ হুসনীর করা নতুন এক গবেষণা থেকে।)

৪) মনের উপর বাজে প্রভাব

ড. ভিনসেন্ট ম্যাটিউস ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটির এক্স-রে স্ক্যানিং এর একজন প্রফেসর। তিনি মানুষের মনের উপর এসব গেইমসের বাজে প্রভাব সম্বন্ধে সবাইকে সতর্ক করেন। অন্যদিকে ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ ড. গ্যাভিন ক্লিয়ারি এবং একদল বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যখন দেখলেন প্রচুর পরিমাণ স্বাস্থ্যগত সমস্যার পেছনে ভিডিও গেইমস দায়ী তখন তিনি এসবের বিরুদ্ধে লিখিত সতর্কবার্তা দেবার উদ্যোগ নিলেন।

একটি গবেষণা মতে গেইম নিয়ে ব্যস্ত থাকা কিছু বাচ্চার মধ্যে প্রচণ্ড রকমের খিঁচুনি দেখা গিয়েছে। গেইমে দেখা প্রচণ্ড উত্তেজনাকর পরিস্থিতি, গন্ডগোল, হইচই তাদের অঙ্গসমূহ এমনকি রক্তেও প্রভাব ফেলেছে। কখনো তো এমন অবস্থায়ও পৌঁছে যায় যে, তা থেকে স্ট্রোক হয়ে মৃত্যু হবারও সম্ভাবনা থাকে।

৫) মৃগীরোগ

দীর্ঘদিনের ভিডিও গেইমে আসক্তি বাচ্চাকে দীর্ঘস্থায়ী মৃগীরোগের কবলে ফেলতে পারে। এ বিষয়টা জাপানে এক গবেষণায় এমনটাই বলা হয়েছে। তাদের মতে জাপানের কিছু বাচ্চাদের মাঝে এই ধরনের প্রভাব দেখা যাচ্ছে। তাদের মতে মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক চার্জকে এসব গেইম উদ্দীপ্ত করে এবং এর ফলে মৃগীরোগে আক্রান্ত হবার আশঙ্কাও দেখা দিতে পারে।

এসব গেইম প্যারালাইসিস বা পক্ষাঘাতেরও জন্ম দিতে পারে। সৌদি আরবের ‘আসির’ প্রদেশে এক ১২ বছরের বাচ্চার হাতে প্যারালাইসিস হবার মতো বিরল ঘটনার দেখা মেলে। এর কারণে ছিল লম্বা সময় ধরে প্লে-স্টেশনে গেইম খেলা। এর ফলে তার হাতের স্নায়ুগুলো দুর্বল হয়ে যেত। ডাক্তাররা জানান এ বাচ্চার হাতকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব না, কারণ তার হাতের সমস্ত স্নায়ুগুলো দুর্বল এবং অকার্যকর হয়ে পড়েছে। তিনি নিশ্চিত করেন যে টানা ১২ ঘণ্টা এবং কখনো কখনো টানা ২০ ঘণ্টা গেইম খেলার জন্যই এমনটি হয়েছে।

৬) স্নায়বিক রোগ এবং হাতকাঁপা

গেইম খেলার সময় নিত্যনতুন উত্তেজনা এবং নার্ভ সিস্টেমের উপর্যুপরি ব্যবহারে এমনটা হয়ে থাকে। যেমন কিছু কিছু গেইমে খুব ভীতিকর দৃশ্য দেখা যায় । এদের মধ্যে রয়েছে কোনো গোরস্থান বা লাশকাটা ঘরে প্রবেশ কিংবা মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা।

ব্রিটিশ শিশুবিশেষজ্ঞ ড. ডায়ানা ম্যাক এ বিষয়ে একটি আর্টিকেল লেখেন। ভিডিও গেইমস খেলার ফলে বাচ্চাদের মনস্তাত্ত্বিক, শারীরিক এবং সামাজিক বিষয়ে যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে তা নিয়ে তিনি পিতামাতা এবং অভিভাবক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি তার চিকিৎসার অভিজ্ঞতা থেকে জানান যে, বাচ্চারা অনেক লম্বা সময় ধরে গেইম খেলার কারণে তাদের মধ্যে স্নায়বিক উত্তেজনা, মাথাব্যথা কিংবা অন্যান্য অঙ্গেও নানা ধরনের ব্যথা অনুভব করে। (স্কটিশ মেডিকেল জার্নাল)

এবার একটা বাস্তব ঘটনার কথা শোনা যাক। একজন লোক তার ছেলেকে সব সময়ই নিত্যনতুন গেইম এনে দিতেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি আশ্চর্য কিছু বিষয় লক্ষ করলেন। দেখলেন এসব গেইম লম্বা সময় ধরে খেলার কারণে তার ছেলে অদ্ভুত কিছু আচরণ করতে শুরু করেছে। দেখা যেত তার ছেলে প্রায়ই কোনো কারণ ছাড়াই চিৎকার দিয়ে ঘুম থেকে উঠে যেত বা ভয় পেয়ে যেত। আস্তে আস্তে তার চলাফেরা খুব ধীরগতির হয়ে গেল। রোবটেরা যেভাবে হাঁটে অনেকটা তেমন। সে অল্পতেই খুব ভয় পেয়ে যেত এবং আশেপাশের যেকোনো শব্দই তাকে ভীত করে তুলত। এসব কারণে তার পড়াশোনায়ও ব্যাপক ক্ষতি হলো। কী বুঝলাম আমরা? বাবা তার ছেলেকে খুশি করার জন্যই এসব এনে দিয়েছিলেন অথচ এই গেইমগুলোও তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াল।

৭) অপুষ্টি এবং হজমের সমস্যা

অনেক বাচ্চাই গেইম খেলায় ব্যস্ত থাকায় তাদের বাবা-মা পরিবারের সাথে খাবার খেতে আসে না। ফলে তারা খাওয়া-দাওয়ায় অনিয়ম এবং অস্বাস্থ্যকর বাসি খাবার খেতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

তৃতীয় প্রভাব : অর্থনৈতিক প্রভাব

অর্থনৈতিক ক্ষতি নানাভাবে হয়ে থাকে। এর শুরু হয় গেইম খেলার জন্য দামি যন্ত্র কেনার মাধ্যমে। তারপর সফটওয়্যার এবং প্রয়োজনীয় গেইম কিনতে হয়। মাঝেমধ্যে যন্ত্রের মেরামত করতে খরচ হয়। কখনো কখনো এটা অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে ভেঙেও যেতে পারে।

এসবের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে আমরা তো আমাদের সেই শত্রুদেরই টাকা দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছি যারা কিনা আমাদের আকিদা-বিশ্বাস, আচার-আচরণ, সংস্কৃতি সবকিছুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

ইসলামের ৫টি মূলনীতি, যেগুলোকে ইসলাম সংরক্ষণ করতে বলে, সম্পদের সংরক্ষণ তার একটি। এবং সম্পদ কখনোই অপাত্রে দান করা যাবে না। যেমনটি আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আনে বলেন :

"আর তোমরা নির্বোধদের হাতে তোমাদের ধন-সম্পদ দিয়ো না, যাকে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য করেছেন জীবিকার মাধ্যম এবং তোমরা তা থেকে তাদের আহার দাও, তাদের পরিধান করাও এবং তাদের সাথে উত্তম কথা বলো।"[২৮]

এসব গেইমের পেছনে আসলে আমরা কত পরিমাণ খরচ করি?

ভিডিও গেইম বিশেষজ্ঞদের মতে একজন সৌদি কিশোর ভিডিও গেইমস খেলা বাবদ বছরে প্রায় ৪০০ ডলার খরচ করে । সৌদি বাজারগুলোতে প্রতিবছরে ৩ মিলিয়ন গেইমের বেচাকেনা চলে যাদের মধ্যে দশ হাজার অরিজিনাল এবং বাকিগুলো পাইরেটেড।

একটি ভিডিও গেইম কোম্পানির সার্কুলেশন ম্যানেজার জানান সৌদি আরবের বাজারে প্রায় ১৮,০০,০০০টি প্লে-স্টেশন খেলার যন্ত্র আছে। এতে বোঝা যায় সৌদি আরবের ৪০% বাড়িতে অন্তত একটা করে এ ধরনের যন্ত্র আছে।

এটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে কেবল বাচ্চারা প্লে-স্টেশনে খেলে এমন নয়; বরং প্রচুর যুবক বয়সী এমনকি বয়স্করাও এ নেশায় আক্রান্ত![২৯]

এক দোকানের ম্যানেজার জানান,

"প্লে-স্টেশনের ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে এবং এটা কেনার ব্যাপারে ব্যাপক আগ্রহ দেখা যায়। এসব গেইমের মধ্যে যেগুলো পাইরেটেড ভার্সন সেগুলোতে খরচ পড়ে ৫ থেকে ১৫ রিয়াল। আর যেগুলো অরিজিনাল ভার্সন সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি ১০০ রিয়ালের উপর দাম। কোনোটা আবার ২৫০ রিয়াল। আর প্লে-স্টেশন যন্ত্র কিনতে প্রায় ৯০০ রিয়ালের মতো খরচ পড়ে যায়। তা ছাড়া পুরো সিস্টেমটা দাঁড় করাতে আরও কিছু টুকটাক জিনিসও কিনতে হয়।"

---

[২৮] সূরাহ নিসা, ৪ : ৫

[২৯] *আত তিফল আল মুতামায়্যিযাহ,* ২৩তম সংস্করণ, যিলক্বদ, ১৪২৫ হিজরি

একজন ভিডিও গেইমস বিক্রেতা যিনি এর ক্ষতিকর দিক সম্বন্ধে জানার পর এসব থেকে সরে আসেন তিনি জানান, একবার এক বাবা দোকানে ঢুকে একবারেই প্রায় ১৫,০০০ রিয়ালের মতো গেইম কিনে নিয়ে যান।

এই ব্যবসায় মুনাফাধারী গোষ্ঠী হচ্ছে আমেরিকান এবং জাপানিজ গেইম নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো। তা ছাড়া এসব গেইমসরবরাহকারী এবং কালোবাজারি গোষ্ঠীও এ থেকে মুনাফা হাসিল করে। বিখ্যাত জাপানিজ ইলেক্ট্রনিক্স নির্মাতা প্রতিষ্ঠান সনি ঘোষণা দেয় যে তারা আশা করছে লাভের হার প্রায় শতকরা ১০৮ ভাগ বেড়ে যাবে। এবং সামনের বছরগুলোতে এর পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে ২৮০ বিলিয়ন ডলারে। আর এই আকস্মিক মুনাফা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হচ্ছে প্লে-স্টেশনের জনপ্রিয়তার বৃদ্ধি।[৩০]

এই ব্যাপারটা যে শুধু দেশীয় অর্থনীতির বারোটা বাজাচ্ছে এমন নয়। ব্যক্তিগত পর্যায়েও এগুলো অর্থনৈতিক ক্ষতিসাধন করছে। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারগুলোতে গেইম এবং সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো কিনতে টাকার বড় একটা অংশ ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। চাকরির ক্ষেত্রে কর্মচারীদের গেইমের প্রতি নেশা থাকলে দেখা যায় তারা দেরি করে অফিসে আসছে কিংবা কখনো অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। ফলে কর্তৃপক্ষ তাদের বেতন কমিয়ে দিচ্ছে। এমনকি কখনো কখনো চাকরিটাই খুইয়ে বসে।

আমাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ জীবনেও এই গেইমগুলো অর্থনৈতিক ক্ষতি করতে পারে। বিশেষ করে যখন তারা পড়াশোনায় খারাপ করছে এবং তাদের শারীরিক এবং মানসিক বিভিন্ন দিকগুলোতে ত্রুটি দেখা দিচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের চ্যালেঞ্জিং বিষয়গুলোতে তারা ধরা খেয়ে যেতে পারে।

ভিডিও গেইমের নেশা

নিছক বিনোদন থেকে ছেলে-বুড়ো অনেকের কাছেই এইসব গেইমগুলো হয়ে উঠেছে নেশার মতো। পুরো বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন গবেষণায় ভিডিও গেমসের ক্ষতিকর প্রভাবগুলো আজ আমাদের চোখের সামনে। সবকিছু জানার পর ডাক্তার থেকে শুরু করে শিক্ষাবিদ, অভিভাবক এমনকি রাজনীতিবিদরাও এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন।

---

[৩০] *আত তিফল আল মুতামায়্যিযাহ,* ২৩তম সংস্করণ, যিলক্বদ, ১৪২৫ হিজরি

চীনে বিভিন্ন সচেতন গোষ্ঠী ইন্টারনেট ক্যাফেতে উঠতি বয়সের ছেলেপেলের মাত্রাতিরিক্ত গেইম আসক্তি নিয়ে তাদের চিন্তার কথা জানিয়েছেন। আটটি সরকারি সংস্থা কিছু নিয়মকানুন প্রণয়ন করেছেন। এসব আইনের কাজ হলো অনলাইন গেমিং কোম্পানিগুলোকে এমন ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করা যাতে গেইমের আসক্তি কমিয়ে নিয়ে আসা যায়।[৩১]

গেইমে আসক্ত এক বাচ্চার মা জানান :

> "আমার বাচ্চা সকাল ১০ টায় ঘুম থেকে ওঠার পর এমন হয় যে অনেক সময় সে চোখ পুরোপুরি খোলার আগেই হেঁটে গিয়ে গেইম চালু করে দেয়। গেইম খেলার আগে সে সকালের নাশতাও খেতে চায় না। খেলতে খেলতে এত বেলা গড়ায় যে অবশেষে দুপুরের খাবারের জন্য তাকে জোর করে নিয়ে আসতে হয়। কিন্তু দেখা যায় খুব তাড়াতাড়ি ১০ মিনিটের মধ্যে খেয়েদেয়ে সে আবার গেইম খেলতে চলে যায়। এরপর সে সন্ধ্যা নাগাদ খেলতেই থাকে। যখন আমরা তাকে আটকাতে যাই তখন হিতে বিপরীত হয়। দেখা যায় তাকে বাধা দেবার কারণে সে তার ভাইবোনের উপর এর ঝাল মেটাচ্ছে। যে বিষয়ে নাক গলানোর দরকার নেই তা নিয়েও ঝগড়া বাধাচ্ছে, ভাইবোনদের কারণ ছাড়াই মারছে। তখন আমাদের মনে হলো প্লে-স্টেশন থেকে দূরে সরানোর কারণেই তার এমন সব আচরণ এবং আমরা ভাবলাম গেইম খেলতে দেওয়াই এর সমাধান।"

ইউনিভার্সিটির একজন পরামর্শদাতা জানান :

"আমি এক ছাত্রকে নিয়ে কাজ করেছি যে কিনা দৈনিক ১২ ঘণ্টারও বেশি গেইম খেলে। গেইমে দক্ষ হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সাধারণত সে একা একা খেলত। যখন আমি তাকে নিয়ে কাজ করা শুরু করলাম এবং প্রায় ৩ মাস চেষ্টা চালালাম তখন কিছু বিষয় খেয়াল করলাম। যেমন :

১) সে সম্পূর্ণ একা একা দিন কাটায়। পরিবারের সদস্যরা পারিবারিক কোনো অনুষ্ঠান বা ঘুরতে যাবার সময় সে কখনোই তাদের সাথে যায় না। এমনকি বাসার মধ্যেও সে তাদের সাথে কোনো সময় কাটায় না। ভিডিই গেইমসের পাশে বসেই সে খাওয়া-দাওয়া করে। এবং খুব হঠাৎ হঠাৎ ছাড়া সে কখনোই তাদের সাথে বাইরে যায় না।

---

[৩১] বাওয়াবাহ আল আরাবিয়া টেকনোলজি নিউজ, ৪.১০.২০০৭ খ্রি.

২) সে ঠিকমতো কাজ করতে পারে না। সে তার কল্পনার জগতে এতটাই বুঁদ হয়ে আছে যে অনেক কিছুকেই স্বাভাবিকভাবে নিতে পারে না। এমনকি তার একান্ত নিজস্ব জগতের নিজস্ব বিষয়গুলোতেও সে খুব আনাড়ি।

৩) এ গেইমগুলো তার জীবন ধ্বংস করে দিচ্ছে তা জানার পরও সে এ নেশা ছাড়তে পারছে না। সে যখন দেখল ভার্সিটিতে এসব কারণে সে ফেইল করছে তখন হতাশ হয়ে একবার ছাড়তে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি।

৪) তার সামাজিক আচরণে ঘাটতি আছে। সে কারও সাথে মেশা বা আলাপ-আলোচনা বা কথাবার্তাও বলতে পারে না। সে মনে করে লোকের সাথে এসবে জড়ানোর কোনো মানে হয় না।

৫) সব ধরনের আজগুবি ও কাল্পনিক বিষয় তাকে আকৃষ্ট করে।

৬) সে সবকিছুকেই একটা প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা মনে করে। এ বিষয়টাতে সে খুব মজা পায়। এমনকি আমি যখন তার চিকিৎসা শুরু করলাম তখন সে আমাকেও চ্যালেঞ্জ করল যে, আমি তাকে আসলেই ঠিক করতে পারব কি না!

৭) মানুষের জীবনের অবস্থা বুঝে সে অনুযায়ী কোনো সিদ্ধান্তে আসার ব্যাপারে তার আপত্তি আছে। এমনকি কেউ এমনটা করলে সে উল্টো তাচ্ছিল্য করে।

৮) সাইকিয়াট্রিস্ট যখন তাকে জ্ঞান, যুক্তি এবং সামাজিক মূল্যবোধ দিয়ে বিচার করার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে গেল, সে তখন তার পরামর্শ নিতে অস্বীকৃতি জানাল।

৯) তার সব টাকাপয়সা সে গেইমের উপর খরচ করে। তার বাবা খুব সচ্ছল মানুষ ছিলেন এবং তার জন্য হিসাব ছাড়া ব্যয় করতেন। নতুন নতুন আকর্ষণীয় সব গেইম কেনার পেছনে সে তার বহু টাকাপয়সা খরচ করে।

১০) সাইকিয়াট্রিস্ট তাকে এসব গেইম থেকে ফিরে আসবার কিছু আচরণগত থেরাপি দেন। সে খুব ভালোভাবেই চেষ্টা করে। কিন্তু শেষবেলায় সে ব্যর্থ হয় এবং প্রোগ্রাম থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়।

১১) মাঝেমধ্যে সে সাগরতীরে গিয়ে অনেক সময় ব্যয় করে। কখনো-বা রাস্তাঘাটে উদ্দেশ্যহীনভাবে এবং বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালায়। সম্ভবত এসব আচরণ স্বাভাবিক জীবনে তার ব্যর্থতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র।”

একজন গেইমে আসক্ত ছেলে জানায় যে, সে তার বন্ধুর সাথে রাত দশটা থেকে শুরু করে পরদিন সকাল আটটা পর্যন্ত সকার গেমস খেলেছে। এর চেয়ে বড় ক্ষতি

আর কীই-বা হতে পারে যে এই মূল্যবান সময়ের হক সে আদায় করে করেনি; বরং অপচয় করেছে।

গেইমে আসক্তি নিয়ে আসতে পারে নতুন এবং বহুমাত্রিক নেতিবাচক প্রভাব। চীনে ১৩ বছর বয়সী এক বালকের পরিবার একটি চাইনিজ গেইম উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। এ মামলার পেছনে মূল কারণ ছিল তাদের ছেলের আত্মহত্যা। টানা ৩৬ ঘণ্টা গেইম খেলার পর সে আত্মহত্যা করে। তারা ১২,৫০০ ডলার ক্ষতিপূরণ চায়।[৩২]

ভিডিও গেইমস আসক্তির কার্যকর ওষুধ

মানুষ যতভাবে তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলো জলে ভাসিয়ে দিতে পারে ভিডিও গেইম আসক্তি তার মধ্যে অন্যতম। আর সময়ের যথাযথ ব্যবহার নিয়ে তো কিয়ামাতের দিনও জিজ্ঞেস করা হবে। মানুষ যদি সময়ের প্রকৃত মূল্য জানত এবং বুঝত যে আখিরাতে ফসল তুলবার ইচ্ছা থাকলে এ দুনিয়াতেই বীজ বুনে যেতে হবে, তবে এইসব অর্থহীন কাজে সময় নষ্ট করে তাদের ইহকাল-পরকাল কোনোটাই নষ্ট করতে চাইত না।

কুর'আনের একটি আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন সময়ের মূল্য এবং অর্থহীন কাজে সময়ের অপচয় সম্বন্ধে কথা বলেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

> **"তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদের কেবল অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে না?"**[৩৩]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵁ থেকে একটা হাদীসও এসেছে, যেখানে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন : "দুটি নিয়ামাত আছে যেগুলোর ব্যাপারে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। তা হলো হলো সুস্বাস্থ্য এবং অবসর সময়।"[৩৪]

ইবনে আব্বাস ﵁ থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীস থেকে জানা যায় : "পাঁচটি জিনিসের আগেই পাঁচটি জিনিসকে কাজে লাগাও। মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে, অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে, ব্যস্ততার আগে অবসরকে, বার্ধ্যকের আগে যৌবনকে এবং দারিদ্র্যের পূর্বে সচ্ছলতাকে।"[৩৫]

---

[৩২] মাজাল্লাত আল আলাম :১৬৪

[৩৩] সূরাহ মু'মিনুন, ২৩ : ১১৫

[৩৪] বুখারি : ৬৪১২

[৩৫] হাকেম এবং যাহাবি থেকে বর্ণিত। দুজনেই একে সহীহ বলেছেন।

ইবনুল কায়্যিম ﷺ বলেন :

> “ সময়ের অপচয় মৃত্যুর চেয়েও জঘন্য। কেননা, মৃত্যু তো শুধু দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তা থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, কিন্তু সময়ের অপচয় মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা এবং আখিরাত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।”[৩৬]

দুইটি অবস্থায় উপনীত হয়ে মানুষ সময়ের প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করতে পারে। তখন মানুষ আফসোস করে। কিন্তু তার এই আফসোস তখন কোনো কাজেই আসে না। এ দুটি সময় হলো :

প্রথম : মৃত্যুর সময়

মানুষ যখন মারা যেতে থাকে এবং বুঝতে পারে অল্প সময় পরেই তার পরকালীন জীবন শুরু হয়ে যাচ্ছে তখন তার ইচ্ছা হয় যদি তাকে একটু অবকাশ দেওয়া হতো। অবকাশ দেওয়া হলে সে ফিরে গিয়ে ভুলগুলো শুধরে নিত এবং ভুলের জায়গায় সঠিক কাজগুলো করে আসত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

> **“মুমিনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে। আর যারা এরূপ করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। আর আমি তোমাদের যে রিযক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করো, তোমাদের কারও মৃত্যু আসার পূর্বে। কেননা, তখন সে বলবে, হে আমার রব, যদি আপনি আমাকে আরও কিছুকাল পর্যন্ত অবকাশ দিতেন, তাহলে আমি দান-সদাকা করতাম। আর সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।”**[৩৭]

কিন্তু এর উত্তরে বলা হবে :

> **“আর আল্লাহ কখনো কোনো প্রাণকেই অবকাশ দেবেন না, যখন তার নির্ধারিত সময় এসে যাবে। আর তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।”**[৩৮]

দ্বিতীয় : কেয়ামতের দিন

আবু বারযাহ আল আসলামি ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন :

---

[৩৬] আল ফাওয়ায়িদ : ৩১ পৃ.

[৩৭] সূরাহ মুনাফিকুন, ৬৩ : ৯-১০

[৩৮] সূরাহ মুনাফিকুন, ৬৩ : ১১

> “কোনো বান্দার পা একটুও নড়বে না যতক্ষণ না তাকে কিছু জিনিস জিজ্ঞেস করা নেওয়া হবে। (সেগুলো হলো) তার জীবন এবং তা কোন পথে ব্যয় করেছে। তার জ্ঞান এবং কীভাবে এটিকে ব্যবহার করেছে। তার সম্পদ এবং কীভাবে তা অর্জন ও ব্যয় করা হয়েছে এবং তার শরীর এবং কীভাবে তাকে কাজে লাগানো হয়েছে।”[৩৯]

তারপর যখন প্রত্যেককে তার কৃতকর্ম অনুযায়ী জান্নাত কিংবা জাহান্নামের ফায়সালা করে দেওয়া হবে তখন জাহান্নামীরা চাইবে তাদের যেন আবার দুনিয়ায় পাঠানো হয় যাতে করে তারা সেখানে সৎ কাজ করে আসতে পারে। আল্লাহ বলেন:

> **“আর সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, ‘হে আমাদের রব, আমাদের বের করে দিন, আমরা পূর্বে যে আমল করতাম, তার পরিবর্তে আমরা নেক আমল করব।’ (আল্লাহ বলবেন) ‘আমি কি তোমাদের এতটা বয়স দিইনি যে, তখন কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত? আর তোমাদের কাছে তো সতর্ককারী এসেছিল। কাজেই তোমরা আযাব আস্বাদন করো, আর যালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।’”**[৪০]

আল হাসান আল বাসরি ﵀ বলেন, “আমি এমন মানুষদের সাথে চলেছি যারা সময়ের ব্যাপারে এতটা সচেতন ছিল আজকাল তোমরা সম্পদের ব্যাপারে যতটা সচেতন।”

> আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ﵁ বলেন, “আমি সেইসব দিনের চেয়ে অন্য কোনো দিনে বেশি আফসোস করিনি, যেদিন সূর্য ডুবে গিয়েছে, পৃথিবীতে আমার সময় আরেকটু কমে এসেছে, কিন্তু আমার নেক আমল বৃদ্ধি পায়নি।”

ইমাম আবু হাতেম আর-রাযির ছেলে আব্দুর রহমান ﵀ বলেন : “আবু হাতেম আর-রাযির খাবার খাওয়ার সময় আমি তাকে পড়ে শুনাতাম, তিনি যখন হাঁটতেন তখন পড়ে শুনাতাম, তিনি যখন গোসলে ঢুকতেন তখন আমি তাকে পড়ে শুনাতে থাকতাম, কিছু আনার জন্য যখন বাড়ির ভেতর ঢুকতেন তখনো আমি পড়ে শুনাতে থাকতাম।”[৪১]

---

[৩৯] তিরমিযি : ২৪১৭; তিনি বলেন, এটি সহীহ এবং গ্রহণযোগ্য মানের।

[৪০] সূরাহ ফাতির, ৩৫ : ৩৭

[৪১] তাহযীব আল কামাল : ২৪/২৮৮

সময়ের ব্যাপারে তার এই সচেতনতা বিফলে যায়নি। এর ফলস্বরূপ তিনি নয় খণ্ডের *আল জারহ ওয়াত তা'দীল* এবং দশ খণ্ডের *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম* লেখেন। তা ছাড়া অন্যান্য কিতাবাদি তো আছেই।

একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন,

> "সে ব্যক্তি নিজের নফসের উপর জুলুম করে যে কিনা উল্লেখিত কাজগুলো ছাড়া অন্যান্য কাজে সময় ব্যয় করে। কাজগুলো হলো : কোনো অধিকার অর্জন, কোনো অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব সম্পাদন, মর্যাদা কিংবা প্রশংসা পাওয়া, ভালো কোনো কাজের পরিবেশ সৃষ্টি অথবা কোনো কিছুতে জ্ঞানার্জন ইত্যাদি।[৪২]

আবুল ওয়াফা ইবনে আকীল আল হাম্বলী ﵀ বলেন,

> "জীবনের একটি ঘণ্টা সময় নষ্ট করাও আমার পক্ষে অসম্ভব। এমন যদি হয় যে আমার জিহ্বা পড়াশোনা কিংবা আলোচনায় ব্যবহৃত হচ্ছে না কিংবা আমার চোখগুলো বইয়ের পাতার উপর নেই, সেই অবসর সময়টুকু ও বিশ্রামের সময়গুলোতেও আমার মাথায় নানা চিন্তা ঘুরতে থাকে। যখনই আমি ঘুম থেকে জাগি তখনই লেখালেখির প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমার মাথায় চলে আসে। আমার তো মনে হয় ২০ বছর বয়সে জ্ঞানার্জনে আমি যতটা আগ্রহী ছিলাম ৮০ বছর বয়সে আমার জ্ঞানস্পৃহা তার চেয়েও তীব্র। আমার খাবার সময়টুকুও যতটা পারি কমিয়ে এনেছি। এমনকি রুটি চিবিয়ে খেতে গেলে কিছু সময় বেশি লাগবে দেখে আমি পানি দিয়ে রুটি গিলে ফেলি।"

তার অন্যান্য কর্মের পাশাপাশি ৬০০ খণ্ডের বিখ্যাত কিতাব *আল ফুনুন* রচনা করেন। তারপরেও তিনি প্রায়ই বলতেন : "জীবনের একটি ঘণ্টা নষ্ট করাও আমার জন্য অনুমোদিত নয়।"[৪৩]

জামালুদ্দিন কাসিমি ﵀ রাস্তাঘাটে কিংবা পাড়ার দোকানে আড্ডা দেওয়া লোকদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আক্ষেপ করে বলতেন : "ইশ! সময় যদি কেনা যেত, তাহলে আমি তাদের কাছ থেকে সময় কিনে নিতাম।" তার প্রায় ৫০-এর অধিক রচনা ছিল। তার পুরোটা জীবন ব্যয় হয়েছে জ্ঞানার্জন, ইসলামী দাওয়াহ

---

[৪২] আদাবুদ দুনয়া ওয়াদ দ্বীন : ১/৫৭

[৪৩] লিসানুল মিযান : ৪/২৪৩

এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। তারপরেও তাঁর ইচ্ছা হতো কারও থেকে কিছুটা সময় কিনে আরেকটু কাজে লাগাতে।

এসব বলার মানে এই নয় যে অবসর সময়গুলো হালাল বিনোদনও করা যাবে না। বরং হালাল বিনোদন তো মানুষকে নতুনভাবে উদ্যমী করে তোলে। তা ছাড়া সারাক্ষণ সিরিয়াস মুড নিয়ে থাকাটা অনেক সময় আত্মাকে কঠিন করে ফেলতে পারে। এর ফলে এক সময় হতাশাও চলে আসতে পারে। মানুষের মনটা স্থির থাকে না। এর স্বাভাবিক প্রবণতা হলো ছুটাছুটি করা। সে চায় এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় যেতে। এক কাজ অনেকক্ষণ করতে তার ভালো লাগে না। সম্ভবত এ জন্যেই আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন হানযালা ﵁-কে উপদেশ দিচ্ছিলেন তখন বলেছিলেন : “যদি কোনো কাজে এক ঘণ্টা ব্যয় করো তবে আরেকটা ঘণ্টা অন্য কিছু করো।”

ইসলামের আলোকে ভিডিও গেইমস

আমরা ইতোমধ্যে এইসব গেইমস সম্বন্ধে জেনেছি এবং তাদের ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়েও আলোচনা করেছি। এখন এসব গেমসের ব্যাপারে ইসলামী শরিয়তের বক্তব্য কী সেটাও খুব স্পষ্ট করে বলা দরকার।

কিছু কিছু গেইম উৎপাদনকারী দেশ নিজেরাই কিছু গেইমকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। আমেরিকান কংগ্রেসের এক সদস্য জানান, কিছু কিছু নোংরা ও অনৈতিক গেইমের নেতিবাচক প্রভাব সম্বন্ধে জানবার পর তারা সেগুলো নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তাদের ধারণা বর্তমানে তো বটেই ভবিষ্যতেও এগুলো সমাজে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে। আমেরিকায় একটা সুন্দর আইন আছে। যারা বাজে গেইমগুলো খেলা বা দেখার ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে উদাসীন তাদের শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা হয়। পূর্ব এবং পশ্চিমের নানা দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গেইম এখন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এই যদি হয় তাদের অবস্থা, তাহলে আমাদের মুসলিমদের তো আরও এগিয়ে থাকা উচিত। আমাদের উচিত যে সমস্ত গেইম ইসলামবিরোধী জিনিসপত্র প্রচার করে সেগুলো নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে সুস্পষ্ট অবস্থান নেওয়া। মুসলিমরা তো তাদের আদর্শ নিয়ে সব সময় গর্বিত থাকবে এবং অবসর কাটাতে এমন কিছু করবে না যা তাদের রবকে অসন্তুষ্ট করে।

ইসলামের কাজই হচ্ছে দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন। যখন কোনো গেইম ইসলামী বিধিবিধানের বিরুদ্ধে যাবে তখনই এটা হারাম হয়ে যাবে। তবে এ নিষেধাজ্ঞার বিভিন্ন স্তর থাকতে পারে। এটা নির্ভর করবে গেইমের কাহিনি, অপছন্দনীয় কোনো ধারণা বা আদর্শের প্রচারে তাদের অবস্থান কোথায়। সুতরাং যে গেইমে ইসলামী আকিদা-বিশ্বাসের সুস্পষ্ট বিচ্যুতি থাকবে তার নিষেধাজ্ঞার মাত্রা স্বাভাবিকভাবেই সেই সমস্ত গেইম থেকে বেশি হবে যেখানে সামান্য কিছু অপছন্দনীয় বিষয় রয়েছে।

ইসলামী আকিদা-বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক যেসব কারণে একটা গেইম হারাম হয়ে যেতে পারে তার মধ্যে নিচের বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ :

আল্লাহ এবং তার ফেরেশতাদের খাটো করে দেখানো

যেমন কিছু গেইমে দেখানো হয় দুনিয়ার ভালো মানুষের সাথে আকাশের বাসিন্দাদের যুদ্ধ চলে কিংবা অনেক সময় একের অধিক দেবতা দেখানো হয়।

খ্রিষ্টানদের ক্রুশের জয়গান

কিছু কিছু গেইমে দেখানো হয় ক্রুশ পরিধান করে একজন সুস্বাস্থ্য এবং অলৌকিক শক্তি প্রাপ্ত হয়। অনেক সময় ক্রুশের কারণে খেলোয়াড় মুক্তি লাভ করে কিংবা নতুন জীবন পায় ইত্যাদি।

খ্রিষ্টানদের পবিত্র দিনগুলোকে সম্মান করা : যেমন কিছু কিছু গেইমে দেখানো হয় খেলোয়াড় ইচ্ছা করলে ক্রিসমাস কার্ড বানাতে পারে।

জাদুকরদের শ্রদ্ধা করা এবং জাদুবিদ্যার চর্চা

ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার : যেমন কিছু গেইমে দেখানো হয় মক্কা নগরী ধ্বংস করলে ১০০ পয়েন্ট পাওয়া যায় আর বাগদাদ ধ্বংস করলে ৫০ পয়েন্ট।

কাফেরদের সবকিছুকে উঁচু ও মর্যাদাবান করে দেখানো : যেমন কিছু গেইমে দেখানো হয় যদি খেলোয়াড় একটা অমুসলিম দেশের আর্মিকে খেলার জন্য বাছাই করে, তাহলে সেটা হয় খুবই শক্তিশালী। আর যদি আরব কোনো দেশের আর্মি বাছাই করা হয়, তাহলে দেখা যায় তারা খুবই দুর্বল।

কাফের সম্প্রদায়ের আচরণের উপর মোহাবিষ্টতা

কিছু কিছু গেইমস আছে যেগুলো অমুসলিম দেশের বিভিন্ন স্পোর্টস ক্লাব এবং অমুসলিম খেলোয়াড়দের বাচ্চাদের কাছে খুব জনপ্রিয় করে তোলে।

ভিডিও গেইমসে পাওয়া আরও কিছু অপছন্দনীয় জিনিস যার কারণে এগুলো নাজায়েজ হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে :

অবৈধ কামনাযুক্ত প্রেমের সম্পর্ক

যেমন কিছু গেইমসে দেখানো হয় কোনো অবৈধ কামনা ও ভালোবাসার জন্য কোনো মেয়েকে ভিলেন বা ড্রাগনের হাত থেকে বাঁচানো।

অশ্লীল ছবি বা চিত্রকর্মের উপস্থিতি

এটা প্রায় অধিকাংশ গেইমেই দেখা যায়। এগুলো যুবকদের সহজেই উত্তেজিত করে এবং তারা নানা ধরনের পাপে জড়িয়ে যেতে পারে।

বাচ্চাদের মধ্যে আগ্রাসী ও ধ্বংসাত্মক আচরণের বীজ ঢুকিয়ে দেওয়া। হত্যা-রাহাজানিকে তাদের চোখে অসংবেদনশীল করে।

মুসলিম দেশের বাজারে প্রচলিত অধিকাংশ গেইমস সন্ত্রাসের প্রেরণা জোগায়। প্রায় ৯০ শতাংশ গেইমস হচ্ছে সন্ত্রাসভিত্তিক গেইমস। যদিও ১৫ কিংবা ১৮ বছরের নিচের বয়সীদের কাছে এসব বিক্রি করা নিষেধ তবুও বাচ্চাকাচ্চাদের কাছে এই গেইমগুলোই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়।

জুয়া বা এ-জাতীয় জিনিস।

বাদ্য-বাজনা

এটা সকলেরই জানা যে ইসলামিক আইনে এটা সুস্পষ্ট হারাম।

যেকোনো গেইম যেটা ইসলামিক আকিদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার চালায় তা হারাম। এ ধরনের গেইমগুলো কেনাবেচার অনুমোদন নেই। সুতরাং এ ধরনের গেইমগুলো খেলা যেমন নিষেধ সে রকম এগুলো আমদানি করা, উৎপাদন করা কিংবা উপহার দেওয়া প্রত্যেকটি কাজই নিষেধ।

যদি কোনো গেইম এই ধরনের ইসলামবিরোধী কাজ থেকে মুক্ত থাকে এবং খেলোয়াড় এ ধরনের অবৈধ কাজ সম্বন্ধে সুপষ্ট ধারণা রাখে, তবে এসবে সাধারণত নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তু যদি কয়েকটি বিষয় চলে আসে, তাহলে এই ধরনের আপাত নিরাপদ গেইমগুলোও হারাম হয়ে যেতে পারে। যেমন :দুইজন খেলোয়াড়ের মধ্যে বাজি ধরা, নামাজ কিংবা ফরজ কাজগুলো ছুটে যাওয়া

মাত্রাতিরিক্ত খেলার কারণে শরীর, চোখ, স্নায়ুতন্ত্র কিংবা কানের ক্ষতি করে ফেলা। সাম্প্রতিক গবেষণা মতে এসব গেইম নেশার মতো হয়ে যায় এবং এগুলো

স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি করে এবং বাচ্চাদের মাঝে টেনশন এবং সহজে বিচলিত হবার প্রবণতা বাড়ায়।

গেইম খেলে দীর্ঘ সময় নষ্ট করা

অনেকে আছে যারা এসব গেইম খেলে জীবনের উল্লেখযোগ্য একটা সময় নষ্ট করে ফেলে। অনেকে তো আবার গেইম খেলে মানুষের কাছে খ্যাতিও পেয়ে যায়। ভয় হয় এসব লোক আল্লাহর সেই কথার অন্তর্ভুক্ত কি না, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন :

> **"দোযখীরা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবেঃ আমাদের উপর সামান্য পানি নিক্ষেপ কর অথবা আল্লাহ তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছেন, তা থেকেই কিছু দাও। তারা বলবেঃ আল্লাহ এই উভয় বস্তু কাফেরদের জন্যে নিষিদ্ধ করেছেন।"**[৪৪]

একটা সম্প্রদায়ের অধিকাংশ সময় ব্যয় হয় যা তাদের মূল পরিচয় বহন করে তা করার মাধ্যমে। এই জিনিসটা গেইম খেলার সময় মাথায় রাখতে হবে। যেমন একজন মুসলিমের দৈনন্দিন কিছু কাজ থাকে। যদি দৈনন্দিন কাজের একটা বড় অংশজুড়ে যদি এই গেইমগুলোই থাকে তবে এটা খেলা সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই না।

আমাদের এই বিষয়টাতে খুব সচেতন হতে হবে যে, যদি একটা গেইমকে অনুমোদিত বলতেই হয় তবে কোনোভাবেই যেন এসব নিয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা কিংবা পুরস্কৃত করার বিষয়গুলো না থাকে। কারণ, এটার সাথে জিহাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এই গেইমগুলো জিহাদের জন্য উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হিসেবে কাজ করে না। এবং এসব ব্যবহার করে যে একজন জিহাদের জন্য শক্তি অর্জন করবে তাও সম্ভব হয় না।[৪৫]

জনপ্রিয় গেইমগুলোর উপর একটি পর্যালোচনা

একবার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া কিছু শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎকার নেবার সময় জানা যায়, তাদের কাছে প্রায় ২০টির মতো প্লে-স্টেশন গেইমস আছে। যখন তাদের এসব গেইমে থাকা নোংরা এবং ইসলামবিদ্বেষী জিনিসগুলো সম্বন্ধে জানানো হলো

---

[৪৪] সূরাহ আরাফ, ৭ : ৫০

[৪৫] আল মুসাবাকাত ওয়া আহকামুহা ফিশ শারীয়াহ আল ইসলামিয়াহ, ড. সা'দ আশ শাতরি; www.islamqa.com

তখন তারা উত্তরে জানাল যে, এসব শর্ত আরোপ করলে মাত্র ২টি গেইমসই ইসলামী বিধানমতে খেলার উপযুক্ত হবে। অর্থাৎ মাত্র ১০ শতাংশ গেইম নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না।

এসব ছাত্ররা ইসলামী লাইনের নয়, জেনারেল শিক্ষিত। কিন্তু যদি এই গেইমগুলো কোনো আলেম, চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দেখানো হতো, তবে তারা অবশ্যই এখানে এমন জিনিস খুঁজে পেতেন যার কারণে এই ১০ শতাংশও অনুমোদন দিতেন না।

সবদিক বিবেচনায় এই গেইমের ব্যাপারটা সত্যিই ভয়ানক। আমাদের এটা নিয়ে অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই। এটা নিয়ে আমাদের মাঝে পর্যাপ্ত পরিমাণ সচেতনতা থাকা জরুরি। সব সময় খেয়াল রাখা জরুরি যে আমাদের সন্তানেরা কখন এসব খেলছে। যদি এসব গেইম এমন কিছু উপাদান থাকে যাতে অল্পস্বল্প উপকারী দিক থাকে, যা কিনা ধর্মীয় জীবন কিংবা দুনিয়াবি জীবনে কাজে আসতে পারে, তবে এগুলো অল্পস্বল্প খেললেও দোষের কিছু এই। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এটাই সবচেয়ে নিরাপদ।

উপকারী কিছু দিয়ে কি এর প্রতিস্থাপন করা সম্ভব?

আমাদের সন্তানেরা প্রতিনিয়ত এ সমস্ত গেইমের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যতসব নোংরা ধ্যানধারণা, আদর্শ, আচার-আচরণ ও সংস্কৃতির সাথে তাদের পরিচয় ঘটছে। এ ধ্যানধারণা ও আদর্শগুলো আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। এই সত্য যেকোনো স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ স্বীকার করবেন। এ কারণে যারা দ্বীনি বিষয়ে সংবেদনশীল তারা এ সমস্ত গেইমের নতুন কোনো সুস্থ বিকল্প খুঁজে তোলার জন্যে জোরেশোরে আওয়াজ তুলেছেন।

প্রশ্ন হচ্ছে সত্যিই কি এ ধরনের বিকল্প বের করা সম্ভব যেখানে থাকবে না ঈমান-বিধ্বংসী কোনো জিনিস?

সমস্যা হচ্ছে এ সমস্ত গেইমগুলোর ক্ষতি যে শুধু ইসলামী আকিদা-বিশ্বাস কিংবা মোয়ামেলাতের সাথে সাংঘর্ষিক এমনটি নয়। এমন যদি হতো যে গেইমগুলো থেকে মিউজিক এবং খ্রিষ্টানদের ক্রুশ সরিয়ে দিলে কিংবা মুসলিমদের আর্মিকে শক্তিশালী করে দেখালে সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে, তাহলে একটা কথা ছিল। কিন্তু সমস্যা তো আরও সুদূরপ্রসারী। এসব গেইম তো মানুষের শারীরিক এবং আত্মিক দিকগুলোরও ক্ষতি করে চলছে।

আমরা কি মুসলিম গেইম তৈরিকারী কোম্পানিগুলোকে রং-বেরঙের উজ্জ্বল আলোযুক্ত কিংবা চমৎকার গ্রাফিক্স সমৃদ্ধ গেইম বানাতে বলব যেগুলো চোখের ক্ষতি করে? কিংবা এতটাই আকর্ষণীয় করে বানাতে বলব যে, এসবের উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় ব্যয় করে আমাদের সন্তানেরা নিজেদের জীবনকে বৃথায় নষ্ট করে চলবে? যে কোম্পানিরা এসব গেইম বানায় তারা এর পেছনে প্রচুর বিনিয়োগ করে । ফলে এরা সহজেই সবচেয়ে ভালোভালো প্রোগ্রামার এবং চিন্তাবিদদের আকৃষ্ট করতে পারে। তারা বড় পরিসরে মানুষের মনস্তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করে বের করে যে মানুষ আসলে কী চাচ্ছে, কী তাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুগ্ধ করে রাখতে সক্ষম। আমরা কি সত্যিই এ ধরনের কোম্পানি বানাতে সক্ষম?

বাস্তবতা হচ্ছে আমাদের এই চ্যালেঞ্জটা নিতে হবে এবং এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দূর করতে বিকল্প কিছু একটা ভাবতে হবে।

আমাদের সমাজের জন্য উপযুক্ত কিছু খুঁজে বের করতে হবে। হতে পারে এগুলোতে যারা আসক্ত হয়ে পড়বে বা মাত্রাতিরিক্ত খেলবে তারা কিছুটা ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তবুও এটা পশ্চিমা দেশের ওই গেইমগুলোর চেয়ে ভালো যেগুলো একাধারে মানুষের আকিদা-বিশ্বাস, স্বাস্থ্য এবং চরিত্রের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

এই বিকল্প খোঁজার যাত্রায় প্রথম ধাপটি হবে এই কাজটি করা কতটুকু যৌক্তিক সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা। একইসাথে কী ধরনের গেইম বানানো হবে তাও ভাবতে হবে। এটা নির্ভর করবে আলেমসমাজ, শিক্ষাবিদ এবং সমাজকর্মীদের গঠনমূলক মতামত নেওয়ার মাধ্যমে।

এরপর যারা এই কাজে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবেন তাদের কাছে বিনিয়োগ চাওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে তাদের অনুপ্রাণিত করতে বলা হতে পারে যে তারা এক মহৎ কাজে বিনিয়োগ করছেন। এই কাজ এমন এক শূন্যতাকে পূরণ করবে যা এতদিন অবিশ্বাসীদের হাতে ছিল। এবং এটাকে কাজে লাগিয়ে তারা আমাদের সন্তানদের আত্মিক দিকগুলোর ক্ষতি করছিল।

এরপর প্রোগ্রামারদের জানাতে হবে তারা যেন তাদের মেধা, শ্রম এমন গেইম বানাতে ব্যয় না করে যেগুলোর কোনো উপকারী উদ্দেশ্য নেই। নিছক সময় কাটানোই যেগুলোর উদ্দেশ্য।

তাদের এমন গেইম বানানোর দিকনির্দেশনা দেওয়া জরুরি যেগুলো মুসলিম বাচ্চাদের উপযোগী এবং যেগুলোতে ইসলামিক পরিবেশ থাকবে। এবং সেগুলোতে অবশ্যই মুসলিম সন্তানদের প্রয়োজনকে মাথায় রাখতে হবে, মাথায়

রাখতে হবে তাদের ইতিহাস, অনুপ্রেরণা এবং সংস্কৃতির জায়গাগুলোও। এভাবেই আমরা ছড়িয়ে দিতে পারি ইসলামী মূল্যবোধগুলো। এর মাধ্যমে প্রতিরোধ করতে পারি দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলা এবং নৈতিক অবক্ষয়ের জায়গাগুলোকে। এদের জায়গায় নিয়ে আসতে পারি আত্মবিশ্বাস, আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক বিকাশের আলোকিত দ্বার।

শুধু ইলেক্ট্রনিক গেইমসের একটা বিকল্প নিয়ে আসা এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; বরং আমাদের উদ্দেশ্য হবে যেন আমরা বাজারে সফল ও জনপ্রিয় এবং চরিত্র-বিধ্বংসী গেইমগুলোর বিকল্প নিয়ে আসতে পারি।

এই গেইমগুলোকে অবশ্যই ইসলামী নিয়মনীতির মাধ্যমে পরিচালিত করতে হবে এবং ইসলামী শরিয়তের বাইরে যাওয়া যাবে না।

গেইম তৈরির পেছনে রাখতে হবে দক্ষ শিক্ষাবিদ এবং যাদের এই বিষয়ে দক্ষতা রয়েছে।

এরপর অভিভাবক সমাজকে আমাদের বোঝাতে হবে যাতে তারা অন্যান্য গেইমের উপর এগুলোকে প্রাধান্য দেন। কেবল এভাবেই নষ্ট গেইমগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় আসা সহজ হবে। কারণ, স্বাভাবিকভাবেই সব নিয়মনীতি রক্ষা করে গেইমগুলোকে ওগুলোর মতো অতটা আকর্ষণীয় বানানো সম্ভব না যে বাচ্চারা নিজেরাই আকৃষ্ট হবে। তবে বাবা-মায়েরা যদি তাদের এসব গেইমে উৎসাহ দেয়, তাহলে তারা সহজেই এতে আগ্রহ পাবে।

তবে বর্তমান সময়ে যেহেতু এ ধরনের বিকল্পগুলো অনুপস্থিত তাই হয়তো আমরা ক্ষতিকর গেইমগুলো থেকে বাচ্চাদের পুরোপুরি সরিয়ে রাখতে পারব না। এ জন্যে প্রয়োজন ব্যাপক পরিসরের ধর্মীয়, সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা।

এ জন্যে ত্বলিবুল ইলম, মনস্তত্ত্ববিদ এবং সমাজবিজ্ঞানীদের একত্র হয়ে পর্যবেক্ষণ করে এমন কিছু গেইমের খোঁজ বের করতে হবে যাতে ক্ষতির চেয়ে উপকার বেশি এবং সেগুলো অনেক বাজে জিনিস থেকেই মুক্ত।

ভিডিও গেইমসগুলো দ্বিমুখী তলোয়ারের মতো। এর প্রচুরসংখ্যক খারাপ দিকের পাশাপাশি কিছু ভালো দিকও রয়েছে। যেমন কিছু গেইমস আছে যেগুলো বাচ্চাদের মাঝে মেধা ও তীক্ষ্ণতার বিকাশ ঘটায়। একেবারে কম গুরুত্বপূর্ণ একটা লাভের মাঝে আছে বাচ্চাদের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতার গুণটা সৃষ্টি করা।

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, ভিডিও গেইমগুলো যদি কিছু নিয়মনীতির আলোকে বানানো হতো এবং সেখানে বাচ্চাদের শিখন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধান

করা হতো তবে এগুলো থেকে কিছু উপকার পাওয়া সম্ভব ছিল। এমনটা হলে বাচ্চারা কোনোরকম ভয়ভীতি বা উত্তেজনা ছাড়া তাদের অবসরের কিছুটা অংশ এসব খেলে ব্যয় করত। তারা কিছু মজার গেইম যেমন গাণিতিক সমস্যা-সংক্রান্ত গেইম, স্মৃতিশক্তি বাড়ায় এমন গেইম বা মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ায় বা নতুন নতুন সৃজনশীল চিন্তা বিকাশে সাহায্য করে এমন সব গেইম খেলতে পারত তাদের অবসর সময়ে।

যদি এমন হয় যে কিছু গেইম খেলায় বাচ্চারা প্রয়োজনীয় জিনিস শিখতে পারে তবে এগুলো তাদের দেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে যখন তাদের বাবা-মায়েরা তাদের মাঝে এসব প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে অপারগ। হতে পারে তাদের সময় বা সামর্থ্যের অভাব থাকতে পারে বা বাসায় এমন কেউ নেই তাদের অনুপস্থিতিতে বাচ্চাদের সেসব শেখাবে। এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রতিভার বিকাশে, মেধা, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে এগুলো তাদের দেওয়া যেতে পারে। তবে অভিভাবকদের অবশ্যই তাদের প্রতি পর্যাপ্ত খেয়াল রাখতে হবে।

পশ্চিমা বিশ্ব কিছু গেইম বানিয়েছে কেবল তাদের জন্যে। এগুলো তারা মুসলমানদের দেবে না। এগুলোকে ন্যারেটিভ বলা হয়। এদের বৈশিষ্ট্য যুদ্ধ নিয়ে কাজ করা। এগুলোকে তারা এত উন্নত করেছে যে, বর্তমান সময়ে যুদ্ধ কিংবা অন্যান্য কাজকর্মে ট্রেনিং এর জন্যেও এগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে। সৈনিক এবং ছাত্র সবাই এগুলোর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। কারণ, এই গেইমগুলো মানুষকে শেখায় কীভাবে পরিকল্পনা থেকে শুরু করে প্রশিক্ষণ কিংবা কোনো পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নেওয়া যায়। এর জন্য তারা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি “ভার্চুয়াল রিয়েলিটির” উপর নির্ভর করে।

এসব গেইমে কম্পিউটারে একটা ত্রিমাত্রিক পৃথিবীকে দেখানো হয়। এর মধ্যে খেলোয়াড় বিচরণ করে। অনেক কিছু দেখে, শেখে। এভাবে করে তাদের বৈজ্ঞানিক দক্ষতা বাড়তে থাকে। এবং তারা কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। এ ছাড়া এগুলো খেলোয়াড়ের মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা বিকাশেও সাহায্য করে। এই যোগ্যতা অর্জনের কারণে দেখা যায় তারা সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করতে পারছে।[৪৬]

---

[৪৬] আল আল’আব আল আলাকত্রুনিয়া ওয়া ওয়াকি আতফালিনা ।-ইসমাইল হুসাইন আবু জা’নাযাহ

ভিডিও গেইমস : সমাধান কোথায়?

আলোচনা থেকে পরিষ্কার যে অনেক পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীরাও এসব গেইমসের ক্ষতিকর বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন। এইসব প্রভাবকে কমিয়ে আনতে তারা কী কী কাজ করেছেন এখন তা দেখব। কারণ, আমরা যদি এর বিরুদ্ধে বলতে যাই লোকে যেন মনে না করে কেবল গোঁড়ামি এবং একগুঁয়েমির কারণেই এসব বলছি। বরং তাদের বুঝিয়ে দেওয়া জরুরি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন এসবের পেছনে পড়ে নিজেদের ধর্ম জীবন উভয়ই হারিয়ে না ফেলে সে জন্যেই আমাদের এ সতর্কতা।

প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যে এসব গেইমের প্রভাব কমাতে কী কী করা হয়েছে চলুন দেখা যাক।

যখন সারা বিশ্বের সচেতন সমাজ এসব গেইমে নিয়ন্ত্রণ আনার ব্যাপারে জোর গলায় আওয়াজ তুললেন তখন থেকেই কিছু দেশ এবং প্রতিষ্ঠান এসব গেইমের বিরুদ্ধে শক্ত আইন প্রণয়ন করলেন। ভিডিও গেইমস বাজারে চালানোতে তারা যেভাবে নিয়ন্ত্রণ এনেছে তা থেকে মুসলিমদের কিছু বিষয় জানার আছে। তারা যেসব কাজ করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিচে আলোচনা করা হলো।

গেইমগুলোর বয়সভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস

অনেকদেশেই গেইমগুলোকে বয়সের ভিত্তিতে ভাগ করে ফেলেছে। কোম্পানিদের উপর আদেশ আছে যেন তারা গেইমগুলোর কভারের উপর বয়সের বিষয়টা লিখে দেয়। যেমন যদি ক্রেতা দেখেন গেইমের গায়ে লেখা ১৮+ তখন বুঝে নেবেন যে, ১৮ বছরের কমবয়সীদের জন্য এটা উপযুক্ত নয় এবং তাদের কাছে এগুলো বিক্রিও নিষিদ্ধ। এভাবে অন্যান্য সংখ্যাও লেখা থাকে যেমন ৩+, ৭+, ১২+ এবং ১৬+। এগুলো দেখেই বোঝা যায় কোনটি কাদের জন্য উপযুক্ত।

এসব দেশগুলো যে কোম্পানিগুলোকে কেবল বয়সভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ করতে বাধ্য করেছে তা-ই নয়; বরং আমেরিকার কিছু রাজ্যে যারা আইন ভঙ্গ করে কমবয়সীদের কাছে এগুলো বিক্রি করে তাদের বিরুদ্ধে জরিমানার ব্যবস্থাও নিয়েছে। তা ছাড়া বয়স্করা যেন কমবয়সীদের সামনে তাদের জন্য অনুপযুক্ত গেইম না খেলে সে ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। এসব গেইম বাচ্চাদের দেওয়ার বেলায় তারা যেন কঠোর থাকেন সেটিও বলা আছে। কোন কোন গেইম

বাচ্চাদের দিতে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে তার একটা তালিকা আছে, যা কিনা নির্দিষ্ট সময় পর পর আপডেট করা হয়।

হত্যা, নৃশংসতা এবং যৌনতায় উৎসাহ দেয় এমন গেইমকে বাধা দেওয়া

কিছু কিছু দেশে যেসব গেইমে রক্তপাত দেখানো হয় সেগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আবার কোম্পানিগুলোকে বলা হয়েছে যে সন্ত্রাসীকে হত্যা করার বদলে জেলে ঢোকানো হচ্ছে গেইমে যেন এমনটি দেখানো হয়। আমেরিকার ইলিনয় রাজ্যে আইন করে এমন সব গেইমের বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে যেগুলোতে বাচ্চাদের সামনে নৃশংসতা বা যৌনতা দেখানো হয়। এই আইন অনুসারে যে দোকানে বাচ্চাদের কাছে এ ধরনের গেইম বিক্রি করতে দেখা যাবে তাদের ১[৪৭],০০০ ডলার পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের অনেক মন্ত্রীরা হত্যা, রাহাজানিযুক্ত গেইমগুলো নিষিদ্ধ করার আবেদন জানিয়েছেন। তা ছাড়া যারা উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের কাছে এসব বিক্রি করে তাদের শাস্তির আওতায় আনার কথা বলছেন।[৪৮]

কিছু গেইমে যেহেতু জুয়া খেলা দেখানো হয় তাই মালয়েশিয়ান সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সব ভিডিও গেইম দোকানগুলো বন্ধ করে দিতে। কারণ, বাচ্চারা এসবে এমনভাবে আসক্ত হয়েছিল যেমনভাবে মানুষ আফিমে আসক্ত হয়। প্রধানমন্ত্রীর মতে এগুলো আফিমের মতোই তাদের নেশায় বুঁদ করে রেখেছিল। তিনি আরও বলেন ভিডিও গেইমস অনেকটা জুয়ায় পরিণত হচ্ছে এবং সমাজে ক্ষতি ছাড়া ভালো কিছু বয়ে আনছে না। (বিবিসি অনলাইন)

অনলাইন গেইমে নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি

আমদানিকৃত গেইমের উপর নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে চীনা সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় একটি প্যানেল গঠন করেছে। এই প্যানেলের কাজ হচ্ছে গেইমগুলো দেশের জাতীয় মূল্যবোধের কোনো লঙ্ঘন করছে কি না কিংবা জাতীয় ঐক্য, নেতৃত্ব এবং

---

[৪৭] সি.এন.এন এরাবিক, ৬.২৮.২০০৫ খ্রি.

[৪৮] *মাজাল্লাত আল আলাম আর রাকামি*, ১৯৩তম সংস্করণ, ১.২৬.২০০৭ খ্রি.

নিরাপত্তার উপর হুমকিস্বরূপ কি না সেগুলো খতিয়ে দেখা। তা ছাড়া সরকারের গোপন কোনো তথ্য এসবের মাধ্যমে ফাঁস হবার আশঙ্কা আছে কি না, জাতীয় গৌরবের হানি ঘটছে কি না,সামাজিক কাঠামোতে বিশৃঙ্খলা কিংবা অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে কি না এসবও তারা খতিয়ে দেখে।

এই প্যানেলের দায়িত্বশীলরা জানান, চীনের বাজারে প্রবেশের আগে প্রত্যেকটি বিদেশি গেইম মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখা হবে। পরীক্ষা ছাড়া কেউ যদি এসব ব্যবহার করে তবে তার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।[৪৯] মুসলিমদেরও এসব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের দেশে প্রয়োগ করা সময়ের দাবি।

ভিডিও গেইমসের আসক্তি দূর করে এমন প্রোগ্রামিং তৈরি

চীনা সরকার যখন লক্ষ করল এসব গেইমস খেলে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করছে, এমনকি কখনো কখনো সারাদিন ইন্টারনেট ক্যাফেতে পার করে দিচ্ছে তখন তারা কিছু নিয়ম করল। তারা অনলাইন গেইম সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এবং যারা এর সাথে জড়িত তাদের একটা নতুন সার্ভিস যোগ করতে বাধ্য করল। সার্ভিসটা ছিল একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম যেটা ভিডিও গেইমসের আসক্তির বিরুদ্ধে লড়বে।

প্রোগ্রামটা এমনভাবে সাজানো যে, একজন খেলোয়াড় সর্বোচ্চ ৩ ঘণ্টাতে ফুল পয়েন্ট পাবে। তাদের মতে ৩ ঘণ্টা যথেষ্ট সময় এবং এতে স্বাস্থ্যঝুঁকিও নেই। তবে এই ৩ ঘণ্টার পর কেউ যদি আরও খেলতে চায় তবে তার পয়েন্ট কাটা যেতে থাকবে। যেমন কেউ যদি টানা ৫ ঘণ্টা খেলে তবে তার থেকে অর্ধেক পয়েন্ট কেটে নেওয়া হবে। এর বেশি যদি কেউ খেলে তবে তার সবগুলো পয়েন্টই কেটে রাখা হবে।

[৪৯] http://arabic.peopledaily.com.cn/৩১৬৬৪/২৫৩৭৭৯৮.html.

কমার্সিয়াল সেন্টারের মহামারি

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সকল কিছুর প্রতিপালক। দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর, তাঁর পরিবার ও সাহাবাগণের উপর। পর কথা হলো, সমাজে একটি প্রতিযোগিতা প্রচণ্ডভাবে চলছে। তা হলো বাজার, ভোগ্যপণ্য, লেটেস্ট ব্র্যান্ড ও পণ্যের খবরাখবর জানার প্রতিযোগিতা। বারবার আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন ও চোখধাঁধানো মূল্যছাড় অফার দেখানোর মাধ্যমে এগুলো আমাদের মাথায় প্রবেশ করানো হচ্ছে। সংবাদপত্রের প্রায় প্রতিটি পাতায়ই কোনো না-কোনো শপিং কমপ্লেক্স বা বিক্রয় মেলার উদ্বোধনের খবর পাওয়া যাচ্ছে। অথবা থাকছে কোনো না-কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দেওয়া র‍্যাফেল ড্র বা মূল্যছাড়ের বিজ্ঞাপন। ক্রেতাদের আকর্ষণ করতে যেন তারা বলছে, "আপনার টাকা ঢালুন, আমাদের মোটাতাজা করুন।" সত্যিই আমরা শপিং প্লাজা, হাইপারমার্কেট ও শপিং মলের যুগে বাস করছি। এই সবগুলো একসাথে শপিং কমপ্লেক্স নামেও পরিচিত। শহরাঞ্চলে, বিশেষ করে বড় বড় সিটিগুলোতে, এগুলো ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে।

এই বিষয়ে আলোচনার কারণসমূহ

১। মানুষের জীবনে মার্কেট বা বাজারের গুরুত্ব। এটাই মানুষের ব্যবসার জায়গা, যেখানে কাজ করে মানুষ অন্নসংস্থান করে।

২। মার্কেট ও মার্কেটগামী মানুষের সংখ্যার বিস্ফোরণ।

৩। এগুলো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৪। এই স্থানগুলো হলো পাপ ও পাপাচারী জনগোষ্ঠীর প্রজননক্ষেত্র।

৫। এই স্থানগুলো অনেক মানুষের বিনোদন ও অবসর সময় কাটানোর স্থানে পরিণত হয়েছে।

৬। এসব স্থানে ইসলামবিরোধী অনেক কর্মকাণ্ড হয়ে থাকে।

৭। ন্যায়পরায়ণতা ও দয়াশীলতার ভিত্তিতে একটি পরিচ্ছন্ন ইসলামী সমাজ গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো বাজারে যাওয়া-আসা ও

লেনদেন-সংক্রান্ত বিধিবিধান ও আদব মেনে চলা। কারণ, এগুলো সার্বিক ইসলামী বিধানেরই অংশ। এর ফলে আমাদের জীবনের সকল লেনদেন হবে শরিয়তের ভিত্তিতে।

৮। সৎকর্মশীল পূর্বসূরিগণ বাজারের আদব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে খুবই তৎপর ছিলেন। আতা ﷺ বলেন, "আল্লাহর যিকিরের মজলিস হলো সেগুলো, যেসব স্থানে হালাল ও হারাম বিধান নিয়ে আলোচনা হয়।" (*তাবারানি* : ৩/২৯৪) অর্থাৎ সালাত, সিয়াম, বিবাহ, তালাক, হাজ্জ, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদির ইসলামী বিধান নিয়ে আলোচনা হয়। এ জন্য তাঁরা এসব বিষয়ে আলাদা কিতাবাদিও রচনা করেছেন। যেমন ইয়াহইয়া ইবনু উমার ﷺ (মৃত্যু : ২৯৮ হিজরি) এর রচিত একটি কিতাবের নাম *আহকামুস সুক* (বাজারের বিধান)। হাসান হুসনি আব্দুল ওয়াহহাবের তাহকীকসহ এটি প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া ইমাম আবু হানিফা ﷺ-এর ছাত্র আল-কাযি আবু ইউসুফ ﷺ (মৃত্যু : ১৮২ হিজরি) করের বিধান নিয়ে একটি কিতাব রচনা করেছেন।[৫০]

শপিং কমপ্লেক্সের আকস্মিক সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ

বাণিজ্যিক কেন্দ্রের সংখ্যাবৃদ্ধির অনেক কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

১। সমাজের উপর বিজাতীয় সংস্কৃতি থেকে আসা ভোগবাদিতার প্রভাব।

২। রিয়েল এস্টেট, খাদ্যপণ্য ও অন্যান্য বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো এসব বাজারে বিশাল অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করে থাকে।

মানুষের এসব কমপ্লেক্সে যাওয়ার কারণ

১। এসব শপিং কমপ্লেক্সে বিলাসিতা, আধুনিকতা ও নজরকাড়া প্রযুক্তির এক পরিবেশ বিরাজ করে।

২। শপিং ও মার্কেটিং-এর জগতে আসা লেটেস্ট সুযোগ-সুবিধাগুলো এসব জায়গায় অফার করা হয়।

৩। এসব মার্কেট কয়েক তলায় বিভক্ত থাকে এবং জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রায় সকল দ্রব্য এখানে পাওয়া যায়।

---

[৫০] সেই কিতাবের নাম হলো *কিতাবুল খারাজ* -শরঈ সম্পাদক

৪। এগুলো অবসর সময় কাটানোর জন্য খুবই লোভনীয় জায়গা। সেখানে উন্নতমানের রেস্টুরেন্ট ও ক্যাফে থাকে। এ ব্যাপারে এক তরুণী তার মন্তব্য জানায় এভাবে, “আমি এসব জায়গায় এসে আমার বান্ধবীদের সাথে সময় কাটানো, আড্ডা দেওয়া, ঘোরাফেরা, ডিনার করা ও শিশা সেবন করার সুযোগ পাই।” আরেকজন অনুযোগ করে যে, তার পিতামাতা দীর্ঘ সময় কর্মস্থলে থাকেন বিধায় সে এসব জায়গায় ঘোরাঘুরি করে সময় কাটায়।

৫। এগুলো পরিবারের সদস্যদের একত্র হওয়ার সুযোগ করে দেয়। পুরো পরিবার মিলে এসব জায়গায় শপিং করা যায়। বন্ধুবান্ধব তো বটেই, এমনকি এগুলো আত্মীয়দেরও সামাজিক মেলামেশার কেন্দ্রস্থল হয়ে গেছে। এ ছাড়া দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক নানা রকম অবৈধ সম্পর্কের চর্চাও এসব জায়গায় অবাধে হয়ে থাকে। প্রায় সময়ই গভীর রাত পর্যন্ত এখানে তরুণ-তরুণীদের ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়।

৬। বয়স্করা এসব জায়গায় এসে চা পান ও সংবাদপত্র পড়ার মাধ্যমে অবসর কাটানোর সুযোগ পায়। কিছু কিছু শপিং মলে ব্লাড শুগার ও প্রেশার মাপার সুব্যবস্থাও থাকে, যা এ সকল বৃদ্ধদের জন্য অতি প্রয়োজনীয়।

৭। জায়গায় জায়গায় ঘোরাঘুরি করার বদলে এক ছাদের নিচেই নানা রকম পণ্য ও সেবার সমাহার পাওয়া যায়। পুরো পৃথিবীর ভোগবাদিতারই বৈশিষ্ট্য হয়ে পড়েছে এটি।

৮। এগুলো মাত্রাতিরিক্ত বিজ্ঞাপন ও প্রচার-প্রচারণা করে থাকে। টিভি, রেডিও, পত্রপত্রিকা, বিলবোর্ড সহ নানা রকম মাধ্যম তারা ব্যবহার করে। ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে নানা রকম লটারি, বড় অঙ্কের পুরস্কার ও বিরাট ছাড়ের অফার প্রায় সারা বছরই লেগে থাকে। নিম্ন আয়, মধ্যম আয় ও উচ্চ আয়—সকল শ্রেণির মানুষকে আকৃষ্ট করতে তারা ভিন্ন ভিন্ন রকম বিজ্ঞাপন ছেড়ে থাকে। এ ছাড়া এরা অল্প প্রয়োজনীয় পণ্যকেও বিজ্ঞাপনে এমনভাবে দেখায় যেন এগুলো বেঁচে থাকার জন্য আবশ্যক, এগুলো না হলে জীবন চলবেই না। এতে ক্রেতারা বিভ্রান্ত হয়ে সেই পণ্য কেনার জন্য দৌড়াঝাঁপ শুরু করে।

৯। কিছু কিছু কোম্পানি অন্য বিখ্যাত বড় বড় কোম্পানির নামে বা একই রকম নাম রেখে পণ্য বিক্রি করে। এতে তাদের সেই বড় কোম্পানির মতো ভালো মানের পণ্য সরবরাহকারী ভেবে ক্রেতারা ধোঁকা খায়। এগুলো ক্রেতাদের সাথে জালিয়াতি করার অন্তর্ভুক্ত। এতে ওই সত্যিকারের কোম্পানির অধিকারও ক্ষুণ্ণ করা হয়। তাদের সকল পরিশ্রম ও খরচের ফলাফল ভোগ করে এ সকল অসাধু ব্যবসায়ীরা।

বাজারের অর্থ

ভাষাগতভাবে বাজার বলতে এমন জায়গাকে বোঝানো হয় যেখানে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়। কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করেন :

> **"তারা বলে, 'এ কেমন রাসূল যে খাবার খায় এবং হাট-বাজারে চলাফেরা করে?'"[৫১]**

অর্থনীতির দৃষ্টিতে বাজার বলা হয় এমন জায়গাকে যেখানে লেনদেন সম্পন্ন হয়। এটি ভৌগোলিকভাবে সীমাবদ্ধও হতে পারে (যেমন : শপিং কমপ্লেক্স) আবার না-ও হতে পারে (যেমন : অনলাইনে বেচাকেনা। যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় অবস্থান করে।)।

শপিং কমপ্লেক্স—কিয়ামাতের একটি আলামত

আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

> "কিয়ামাতের পূর্বে শুধু নির্দিষ্ট লোকদেরই সালাম দেওয়া হবে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে, এমনকি নারী তার স্বামীকে ব্যবসায়ে সহযোগিতা করবে। এ ছাড়া আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা হবে, সত্য সাক্ষ্য গোপন করা হবে এবং জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে কলমের ব্যবহার বেড়ে যাবে (স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার কারণে)।"[৫২]

এই হাদীস থেকে বোঝা যায় মানুষ তাদের পার্থিব জীবনের প্রতি কতটা গুরুত্ব দেবে এবং একে আরও উন্নত করতে কতটা তৎপর হয়ে উঠবে।

আল-হাসান আল-বাসরি ﵀ বলেছেন, "আমরা এমন সময়ও পার করেছি, যখন বলা হতো 'অমুক অঞ্চলের ব্যবসায়ী, অমুক অঞ্চলের লেখক।' একেকটি অঞ্চলে একজনের বেশি ব্যবসায়ী বা একজনের বেশি লেখক থাকত না।" তিনি আরও

---

[৫১] সূরাহ আল-ফুরকান, ২৫ : ৭

[৫২] *আহমাদ* : ১/৪০৭; *আল-হাকিম* : ৪/১১০, তিনি একে সহীহ বলেছেন। আল-হাইসামি ﵀ বলেছেন, "এর বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমে ব্যবহৃত বর্ণনাকারী।"-*মাজমাউয যাওয়াইদ* : ৭/১৭৮

বলেন, “কোনো ব্যক্তি বিশাল কোনো এলাকায় গিয়ে মাত্র একজন লেখক খুঁজে পেত।”[৫৩]

কিয়ামাতের ছোট আলামতগুলো মূলত দুটি কারণে উল্লেখ করা হয়।

প্রথমত, কিয়ামাতের নৈকট্যের ব্যাপারে জানানো, যাতে মানুষ কিয়ামাতকে স্মরণ করে। এসব লক্ষণের কোনো একটি যখন ঘটবে, তখন সুস্থ জ্ঞানসম্পন্নরা বুঝতে পারবে কিয়ামাত খুব নিকটবর্তী। এর ফলে তারা কিয়ামাতকে স্মরণ করবে।

দ্বিতীয়ত, এই কথা জানিয়ে দেওয়া যে, উল্লেখিত বিষয়গুলো মানুষকে কিয়ামাতের ব্যাপারে গাফেল করে রাখে। হালাল ও হারাম উভয় রকম বিষয়ই মানুষকে কিয়ামাতের ব্যাপারে গাফেল করতে পারে।

এক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন,

> “কিয়ামাতের একটি লক্ষণ হলো ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে, অজ্ঞতা ছড়িয়ে পড়বে, মদ পান করা হবে এবং প্রকাশ্যে ব্যভিচার করা হবে।”

এ ছাড়া এমন আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে।

এমন একটি সমাজও নেই, যেখানে কেনাবেচা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে অথচ দ্বীন ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো কিছুই ঘটেনি। এ রকম সাংঘর্ষিক কয়েকটি বিষয় হলো হারাম দ্রব্যের বেচাকেনা, সুদ, নানাভাবে সুদকে হালাল করার চেষ্টা, মানুষকে ঠকানো, সালাত ছেড়ে দেওয়া, প্রবৃত্তির অন্ধ অনুসরণ ইত্যাদি।

বাজারগুলো খুব কাছাকাছি হবে

আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “কিয়ামাত ততদিন সংঘটিত হবে না, যতদিন না বাজারগুলো একে অপরের খুব কাছাকাছি চলে আসে।”[৫৪]

---

[৫৩] *আত-তামহীদ* : ১৭/২৯৩

[৫৪] *আহমাদ* : ২/৫১৯; আল-হাইসামি رحمه الله বলেন, “এর বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনাকারী; শুধু সাইদ ইবনু সামআন ছাড়া, তবে তিনিও নির্ভরযোগ্য।”-*আয-যাওয়াইদ* : ৭/২৭৬। শাইখ আল-আলবানি رحمه الله *আস-সিলসিলা আস-সহীহা* : ৬/৬৩৯ গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় শাইখ হামুদ আত-তুয়াইজিরি ﵀ বলেন, "বাজার কাছাকাছি আসা বলতে অনেকে বুঝেছেন কিছু বাজারের ব্যবসায় লাভ করতে ব্যর্থ হওয়া। সঠিক ব্যাপার আল্লাহই ভালো জানেন। এখান থেকে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে যে অর্থ বোঝা যায় তা হলো, যা আমাদের সময়ে সংঘটিত হচ্ছে। দুনিয়ার মানুষ স্থল ও আকাশযানের মাধ্যমে একে অপরের নিকটবর্তী হয়ে গেছে। এ ছাড়া রেডিও ও ফোনের মতো বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি দূর-দূরান্তে কথা পৌঁছানোর মাধ্যমে বাজারগুলোকে খুব কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। ফলে সারা বিশ্বের ব্যবসায়ীদের না জানিয়ে কোনো এক জায়গায় দ্রব্যের দাম বাড়ানো বা কমানো প্রায় অসম্ভব হয়ে গেছে। দাম বাড়লে সকলেই বাড়ায়, কমলেও সকলেই কমায়। এক দিনের দূরত্বে থাকা বাজারে মানুষ সহজেই চলে যায় এবং দিন থাকতেই ফিরে আসে। আবার এক মাসের দূরত্বে থাকা বাজারেও মানুষ প্লেনে করে সহজেই চলে যায় এবং কিছুদিনের মাঝেই ফিরে আসে। অতএব, বাজারগুলো তিন রকমে কাছাকাছি চলে এসেছে।

প্রথমত, দামের ঊর্ধ্ব ও নিম্নগতির ব্যাপারে দ্রুত জানতে পারা।

দ্বিতীয়ত, দূর-দূরান্তের বাজারে দ্রুত আসা-যাওয়া করা।

তৃতীয়ত, সকল বাজারে কোনো নির্দিষ্ট দ্রব্যের প্রায় কাছাকাছি দাম বিরাজ করা।

আল্লাহই ভালো জানেন।"[৫৫]

অতএব, বাজারের নিকটবর্তী হওয়াটা এখন বাস্তব জগতে যেমন সত্যি, ইন্টারনেটের মতো অবস্তুগত জগতেও সত্যি। ইন্টারনেটভিত্তিক ক্রয়-বিক্রয়ের জগৎ সম্পর্কে যার ধারণা আছে, সে এই হাদীসের বাস্তবতা খুব সহজেই ধরতে পারবে। ই-বে ডট কমের মতো ওয়েব সাইটগুলোতে সারা বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে পণ্য নিলামে তোলা হয়, যেখানে নিলামে তোলা পণ্যের সংখ্যা ত্রিশ লক্ষ ছাড়িয়েছে। যে কেউ যেকোনো প্রান্ত থেকে পণ্য কিনতে পারে, আবার যেকোনো প্রান্তে নিজের পণ্য বিক্রিও করতে পারে। আর এভাবে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার লেনদেন হয়। এ জন্যই ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট টনি ব্লেয়ার তাঁর দেশের ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন যে, "ইলেকট্রনিক ট্রেডের দুনিয়ায় জায়গা করে নিতে না পারলে ব্যবসার জগতেই তারা জায়গা পাবে না"।

[৫৫] ইতহাফুল জামাআহ ফিল ফিতান ওয়াল মালাহিম ওয়া আশরাতুস সাআহ : ২/১৯৫

ইসলামে বাজার-মার্কেট।

বাজার হলো আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত স্থান। আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

“জমিনে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান মাসজিদ, আর সবচেয়ে ঘৃণিত স্থান বাজার।”[৫৬]

ইমাম আন-নববী ﵀ বলেন,

> “আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান মাসজিদ, কারণ এখানে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য করা হয় ও তা তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর বাজার আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত স্থান, কারণ এ জায়গায় লোক ঠকানো, ধোঁকা দেওয়া, সুদ, মিথ্যা শপথ, কথা দিয়ে কথা না রাখা, আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হওয়ার মতো কাজগুলো হয়ে থাকে।”[৫৭]

ইবনু বাত্তাল ﵀ থেকে ইবনু হাজার ﵀ বর্ণনা করেন, “এটি হলো সাধারণ চিত্র। এ ছাড়া ব্যতিক্রম কিছু বাজার তো আছেই যেখানে অনেক মাসজিদের চেয়েও বেশি পরিমাণে আল্লাহর স্মরণ করা হয়ে থাকে।”[৫৮]

বাজারের শোরগোল

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেছেন,

> “বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা আমার নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে তাদের কাছাকাছি যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেরা দাঁড়াবে।” তিনি এ কথা তিনবার বলেন। তারপর বলেছেন, “সাবধান! তোমরা (মাসজিদে) বাজারের মতো শোরগোল করবে না।”[৫৯]

ইমাম আন-নববী ﵀ বলেন, “বাজারের শোরগোল বলতে মসজিদে মেলামেশা, ঝগড়া, উঁচু স্বরে কথা বলা, গোলমাল, ও সেখানে সংঘটিত হওয়া নানা রকম ফিতনাকে বোঝানো হয়েছে।”[৬০]

---

[৫৬] *মুসলিম* : ৬৭১
[৫৭] আন-নববী প্রণীত *সহীহ মুসলিমের* ব্যাখ্যাগ্রন্থ : ৫/১৭১
[৫৮] ফাতহুল বারি : ৪/৩৩৯
[৫৯] *মুসলিম* : ৪৩২
[৬০] আন-নববী প্রণীত *সহীহ মুসলিমের* ব্যাখ্যাগ্রন্থ : ৪/১৫৬

আল-মিরকাতে বলা হয়েছে,

"এর অর্থ হলো গলার স্বর উঁচু করা। আল্লাহ তা'আলার সামনে সালাত আদায় করতে দাঁড়ানোর আগে তিনি এমনটি করতে নিষেধ করেছেন। তাই আমাদের নীরবে ও ইবাদাতের আদব মেনে থাকতে হবে। এ ছাড়া এখানে (বিপরীত লিঙ্গের) মেলামেশাও বোঝানো হয়েছে। কাজেই এর অর্থ হলো, বাজারে গমনকারীরা যেভাবে মেলামেশা করে, সেভাবে মেলামেশা করা যাবে না। এ রকম মেলামেশার ফলে জ্ঞানীদের সাথে অজ্ঞদের কোনো পার্থক্য থাকে না। এবং নারী, শিশু ও অন্য সকলে মিশ্রিত হয়ে যায়।"[৬১]

আত-তীবি ﵀ বলেছেন, "এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, রাসূল ﷺ বুঝিয়েছেন বাজারের বিষয়াদি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করো। না হলে সালাতে আমাকে অনুসরণ করতে পারবে না।"[৬২]

নবীজি ? বাজারে শোরগোল করতেন না

আবু আব্দুল্লাহ আল-জাদালি ﵀ আয়িশা ﵂-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জবাব দিলেন, "তিনি নিজেও অশ্লীল ছিলেন না এবং অশ্লীল কাজে লিপ্তও হতেন না। তিনি বাজারে শোরগোল করতেন না। খারাপ আচরণের শোধ নিতে তিনি খারাপ আচরণ করতেন না; বরং তিনি ক্ষমা করতেন ও এড়িয়ে যেতেন।"[৬৩]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস ﵁ বলেন, "আল্লাহর কসম! তাওরাতে তাঁর (রাসূলুল্লাহর) বর্ণনা প্রায় সেভাবেই এসেছে, যেভাবে কুরআনে এসেছে।

(এতে বলা হয়েছে) 'হে নবী, আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী, ও নিরক্ষরদের রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসেবে। তুমি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি তোমাকে নাম দিয়েছি 'বিশ্বস্ত'। তুমি কর্কশ বা কঠিন হৃদয় নও এবং তুমি বাজারে শোরগোল করো না।'"[৬৪]

ইবনু হাজার ﵀ বলেন, "সাখাব শব্দের (যা উক্ত হাদীসে এসেছে) অর্থ হলো, ঝগড়ার কারণে স্বর উঁচু করা। এ থেকে আরও বোঝা যায় যে শ্রেষ্ঠতম নেতা,

---

[৬১] মিরকাতুল মাফাতীহ শারহ মিশকাতুল মাসাবীহ : ৪/১৯৯

[৬২] তুহফাতুল আহওয়াযি : ২/১৭

[৬৩] *তিরমিযি* : ২০১৬, তিনি একে সহীহ বলেছেন; *আহমাদ* : ৬/২৪৬; আল-আলবানি *মিশকাতুল মাসাবীহ* : ৩/২৬৫ কিতাবে একে সহীহ বলেছেন।

[৬৪] *বুখারি* : ২০১৮

আমাদের নবীজি ﷺ বাজারে ঢোকার ফলে তাঁর মর্যাদা কমে যায়নি। কারণ, এখানে কেবল শোরগোল করাকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, বাজারে প্রবেশ করাকে নয়।"[৬৫]

বাজার হলো গাফেলকারী, যদিও তাতে মুসলিমদের জন্য কিছু উপকার রয়েছে

আবু হুরায়রা ﵁ বলেন,

> "লোকে বলে আবু হুরায়রা (হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে) খুবই দক্ষ। আসল কথা হলো, আমাদের মুহাজির ভাইয়েরা বাজারে বেচাকেনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন আর আনসার ভাইয়েরা নিজেদের ধন-সম্পদ দেখাশোনায় ব্যস্ত ছিলেন। সেখানে আবু হুরায়রা আল্লাহর রাসূলের সার্বক্ষণিক সহচর ছিল এবং পেটে যা-ই পড়ত তাতেই সন্তুষ্ট ছিল। সে এমন সময়ে উপস্থিত থাকত, যখন তাঁরা উপস্থিত থাকতেন না। আর এমন জিনিস মুখস্থ করত, যা তাঁরা মুখস্থ করতেন না।"[৬৬]

উবাইদ বিন উমাইর ﵀ থেকে বর্ণিত আবু মূসা আল-আশআরি ﵁ একবার উমার বিন আল-খাত্তাব ﵁-এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। কিন্তু তিনি অনুমতি দিলেন না, যেন তিনি কোনো কিছুতে ব্যস্ত ছিলেন। ফলে আবু মূসা ফিরে গেলেন। উমার কাজকর্ম থেকে অবসর হয়ে আবু মূসাকে খোঁজ করলেন। তাকে বলা হলো, "তিনি তো চলে গেছেন।" উমার তাঁকে ডাকিয়ে আনার পর আবু মূসা বললেন, "আমাদের আদেশ করা হয়েছে যে, (গৃহবাসী অনুমতি না দিলে) আমরা যেন ফিরে যাই।" উমার বললেন, "এ কথার দলিল কী?" আবু মূসা আনসারদের জামাতের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা ﷺ বললেন, "আমাদের মধ্যে কেবল কনিষ্ঠতম ব্যক্তিই এর সাক্ষ্য দিতে পারবে, আর সে হলো আবু সাঈদ আল-খুদরি ﵁।" তিনি আবু সাঈদকে নিয়ে ফেরত এলেন (এবং আবু সাঈদ উমারকে হাদীস শোনালেন)। উমার বললেন, "আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর এ ব্যাপারটি আমার অজানা ছিল। বাজারে দরদাম আর বেচাকেনা আমাকে ব্যস্ত ও গাফেল করে ফেলেছিল।"[৬৭]

ইবনু হাজার ﵀ বলেন, "এর অর্থ তাঁকে ব্যবসায়িক কাজে বাইরে থাকতে হয়েছিল। ব্যস্ত ও গাফেল হয়ে যাওয়া বলতে তিনি বুঝিয়েছেন যে, তিনি রাসূল

---

[৬৫] ফাতহুল বারি : ৪/৩৪৩

[৬৬] *বুখারি* : ১১৮; *মুসলিম* : ২৪৯৩

[৬৭] *বুখারি* : ১৯৫৬; *মুসলিম* : ২১৫৩

ﷺ-এর সাথে দীর্ঘতর সময় কাটাতে না পারায় অন্যেরা এমন হাদীস শুনতে পেরেছে যা তিনি নিজে শুনতে পারেননি। তবে তিনি ব্যবসায়িক কাজে বাইরে থাকতেন পরিবারের ভরণপোষণের আঞ্জাম দেওয়ার জন্য, যাতে অন্যের কাছে হাত পেতে ছোট হওয়া না লাগে।”[৬৮]

পশ্চিমা ধাঁচের কেনাকাটা

পশ্চিমা ভোগবাদের বৈশিষ্ট্য হলো ক্রেতাদের মধ্যে পণ্য ক্রয় করার জন্য নানাভাবে লোভ সৃষ্টি করে তাদের যত দীর্ঘ সময় সম্ভব দোকানপাটে ধরে রাখা। শপিং মল ও কমপ্লেক্সগুলোর কর্মীরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে এ কাজটি করার জন্য।

এ কারণেই বড় বড় শহরগুলোকে চেনার জন্য এসব বড় বড় শপিং কমপ্লেক্সই উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হয়ে উঠেছে। আধুনিকতম প্রযুক্তির সাহায্যে এসব শপিং কমপ্লেক্সের ভেতর-বাহির চিত্তাকর্ষক করে নির্মাণ করা হয়, তার উপর এগুলো থাকে শহরের প্রাণকেন্দ্রে—যাতে মানুষ সহজেই খুঁজে পায়। এগুলো অনেক বেশি প্রশস্ত হয়, যাতে সব রকমের দোকানকে জায়গা করে দেওয়া যায়। শুধু তা-ই না, ভিআইপি পার্কিং, বাগান, ঝরনা, এসি, লিফট, এস্কেলেটর, পানির সুব্যবস্থা, টয়লেট, সালাতের জায়গাসহ নানা রকম সেবা ও সুবিধা দিয়ে এগুলো ভর্তি।

এই কারণে বড় বড় শহরগুলোকে মানুষ এখন এসব শপিং কমপ্লেক্সের মাধ্যমেই চেনে।

এসব জায়গায় বিশ্বের নামিদামি সব ব্র্যান্ডের জন্য দোকান বরাদ্দ থাকে। পুরো এক তলা জুড়ে শুধু খাবার ও রেস্টুরেন্ট থাকে। বাচ্চাদের খেলার জন্য ভিডিও গেইমসসহ এমনভাবে আলাদা জায়গা তৈরি করা হয়, যেন তা একটি কৃত্রিম শহর। বসে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য থাকে আরামদায়ক আসন এবং সময় কাটানোর জন্য থাকে বিশাল স্ক্রিনের টিভি। এই সবকিছুর উদ্দেশ্য হলো সব রকমের ক্রেতাদের পছন্দ অনুযায়ী তাদের চাহিদা মেটানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করা।

এসব কারণে অনেক পরিবার শপিং মলে যেতে ভালোবাসে। বিশেষ করে যেসব জায়গায় মুদি পণ্য ক্রয় করা যায় এবং যেসব কমপ্লেক্স নতুন নতুন উদ্বোধন হয়েছে সেগুলোয়। ফলে বড় বড় ব্র্যান্ডও এসব কমপ্লেক্সে শাখা খোলার জন্য ছুটে আসে।

এসব শপিং কমপ্লেক্স সবদিক দিয়েই পশ্চিমা ধাঁচের শপিং এর অনুকরণ করছে। এগুলোর নির্মাণশৈলীও পশ্চিমা স্থাপত্যবিদ্যার অনুকরণে হয়। গ্লাস ডিসপ্লে ও

---

[৬৮] ফাতহুল বারি : ৪/২৯৯

ইন্টারফেইস ব্যবহার করে পণ্যগুলোকে একটা রহস্যময় রূপ দেওয়া হয়। পশ্চিমা ভোগবাদের তত্ত্ব অনুযায়ী তারা ক্রেতা ও পণ্যের মাঝে একটি লোভনীয় দূরত্ব দাঁড় করায়।

এ ছাড়া বিজ্ঞাপন ও প্রচার-প্রচারণায় অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। পোস্টার, বিলবোর্ড, পত্রিকা ও টিভি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানানো হয় যে বড় বড় ফিল্ম স্টার ও সেলেব্রিটিরা এই পণ্য ব্যবহার করে। রংচং, আলো ও ম্যানিকুইন ব্যবহার করে পণ্যকে আকর্ষণীয় করা হয়। পণ্যের সাথে সাথে আসা এই সব উপস্থাপন ভঙ্গিমার কারণে ক্রেতার চোখে পণ্যটি এক স্বর্গীয় বস্তুতে পরিণত হয়। আসলে পণ্য বিক্রয় শুরুই হয় দৃষ্টিবিভ্রম ঘটানোর মাধ্যমে।

দশ হাজার টাকার একটি পণ্যের দাম লেখা থাকে ৯,৯৯৫/-। ক্রেতা এই দাম দেখে মনে মনে অনুভব করে যে, পণ্যের দাম দশ হাজার থেকে অনেক কম। আসলে ৫ টাকার পার্থক্য এমন কিছুই নয়। এটাও পশ্চিমা ভোগবাদীদের ক্রেতা আকর্ষণের আরেকটি পদ্ধতি।

শপিং সেন্টারগুলোর ভেতরের দৃশ্য

এসব মার্কেটের ভেতর আসলে কী হয়?

এক নজর চোখ বুলালেই এমন অসংখ্য পণ্য চোখে পড়বে, যার বেচাকেনা শরিয়তের বিরোধী। এগুলোর ব্যাপারে সতর্ক করা আবশ্যক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

> **"যে ধ্বংস হওয়ার, সে যাতে সুস্পষ্ট দলিলের ভিত্তিতেই ধ্বংস হয়। আর যে বেঁচে থাকার, সেও যেন সুস্পষ্ট দলিলের ভিত্তিতেই বেঁচে থাকে।"**[৬৯]

আর যাতে আমরা আমাদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকতে পারি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

> **"তোমাদের প্রতিপালকের নিকট (দায়িত্ব পালন না করার) অভিযোগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আর তারা যাতে তাকওয়া অবলম্বন করে।"**[৭০]

---

[৬৯] সূরাহ আল-আনফাল, ৮ : ৪২

[৭০] সূরাহ আল-আরাফ, ৭ : ১৬৪

প্রথমত : অর্থনৈতিক সমস্যা

১. শপিং উন্মাদনা উসকে দেওয়া

এ সকল শপিং কমপ্লেক্সে সকল শ্রেণি-পেশা ও বয়সের মানুষেরা যাতায়াত করে। এমনকি বাচ্চারাও। এ জন্যই দেখা যায় এসব মার্কেটে সব সময় ভিড় লেগেই আছে। কারও শপিং কার্ট বা ব্যাগ পণ্যের ভারে উপচে পড়ছে। তারপরও আরও জিনিস ক্রয় করছে। অথচ এসব জিনিসের মধ্যে অনেককিছুই বাসায় নেওয়ার পর অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে থাকতে শেষে একদিন ব্যবহারেরই অনুপযোগী হয়ে পড়বে।

২. সমাজকে ভোগবাদী সমাজে পরিণত করা

আবাসন সংকটের কারণে বাড়ি ভাড়া বাড়তে বাড়তে ২০% পর্যন্ত বেড়েছে। তারপরও যেখানে সুযোগ পাচ্ছে সেখানেই আবাসিক এলাকাগুলো রাতারাতি বাণিজ্যিক এলাকায় রূপান্তরিত হচ্ছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, সম্পদ আসলে বিনিয়োগ সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে ভোগবাদী সংস্কৃতিতে প্রবেশ করছে। সবাই ফার্স্ট ক্লাস কনজিউমারে পরিণত হচ্ছে। মানুষ এমন পণ্য ক্রয় করতে ব্যস্ত যা না তাদের কোনো দরকার আছে, আর না কেনার আর্থিক সামর্থ্য আছে। আর এই অনর্থক প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে ঋণের পাহাড়ে চাপা পড়ছে সবাই।

৩. ভোক্তা প্রলুব্ধকরণ প্রক্রিয়া

"ক্রেতা আকর্ষণ পদ্ধতি" অবলম্বন করে শপিং কমপ্লেক্সগুলো এতই সফল হয়েছে যে, এখন শুধু বড়লোকরাই শপিংয়ে যায় না; বরং স্বল্প আয়ের মানুষেরাও সমান তালে এসব জায়গায় দৌড়াচ্ছে। এদের তৈরি করা ধোঁকায় পা দিয়ে মানুষ শেষ আশ্রয় হিসেবে ব্যাংক লোনের দিকে ছুটছে। মূল্যছাড়, আবেদন সৃষ্টি, গুণগত মান ও বিজ্ঞাপনের ফুলঝুরি এসবের জন্য দায়ী। "একটি কিনলে একটি ফ্রি" জাতীয় অফারগুলো মানুষকে এমন জিনিস কিনতে বাধ্য করছে, যা আসলে তাদের দরকার নেই। মানুষ দিশেহারা হয়ে যায় যে, কোনটা ফেলে কোনটা কিনবে। হয়তো একটি মাত্র ব্যাগ নিয়ে শপিং কমপ্লেক্সে ঢুকেছিল। কিন্তু পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই গোটা কয়েক ব্যাগ হাতভর্তি করে বের হয়।

একজন ক্রেতা বলেছেন, "অতিরিক্ত জিনিস কেনার জন্য দোকানপাটগুলো ক্রেতাদের উপর একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব তৈরি করে। একজনের শপিং ট্রলি ভর্তি

পণ্য দেখলে অন্য আরেকজনও প্রলুব্ধ হয়। খালি ট্রলি ঠেলে নিয়ে যেতে তখন যেন সে লজ্জা পেতে শুরু করে।”

৪. নারী ক্রেতা

ক্রেতাদের মধ্যে নারীদের সংখ্যাই বেশি থাকে। অবসর সময় কাটানোর জন্য তাদের কাছে সেরা বিনোদনের নাম হয়ে উঠেছে শপিং। ভোগবাদকেই মনে করা হয় নারীর মানসিক ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলার উৎকৃষ্টতম উপায়। এমনকি নারীদের এই শপিং নেশাকে “shopaholics” নামে আলাদা বিশেষণে সংজ্ঞায়িত করার দরকার পড়েছে। অপচয় জিনিসটি যেন ধীরে ধীরে নারীদের একক সম্পত্তিতে পরিণত হচ্ছে।

এক জরিপে দেখা গেছে যে, অনেক নারীই তাদের স্বামীর কাছে খরচের পরিমাণ গোপন করে। পঁচাত্তর শতাংশ নারী ক্রেতা স্বীকার করেছেন যে, তাঁরা বাসায় খরচের পরিমাণ কমিয়ে বলেন এবং ক্রয়ের রশিদ ছিঁড়ে ফেলেন। বিক্রেতারাও স্বীকার করেন যে, তাঁদের বেশির ভাগ ক্রেতা নারী।[৭১]

অতিরিক্ত কেনাকাটার এই রোগের অন্যান্য কারণ হলো :

ক. অতীতের দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ থাকা কিংবা সম্পদের অভাবের কারণে দীর্ঘদিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকা।

খ. কিছু কিছু অভিভাবকের অধীনস্থদের খরচ চালানোর ব্যাপারে কৃপণতা।

গ. অনেক স্ত্রীরাই দুশ্চিন্তায় থাকে এই ভেবে যে, তাঁদের স্বামীরা বোধহয় সম্পদ জমা করে রাখছে।

আল্লাহ্ বলেন :

> **“আর যখন তারা ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না, আর কৃপণতাও করে না; এ দুয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে।”**[৭২]

৫. অবাস্তব দাম

এই সব দোকানের ব্যাপারে প্রায়ই গলাকাটা দাম রাখার অভিযোগ পাওয়া যায়। দেখা যায় এক জোড়া জুতোর দাম ১০,০০০ টাকা, তো বিয়ের পোশাকের দাম

---

[৭১] *মাজাল্লাতুল উসরাহ,* ১৫৬; রবিউস সানী, ১৪২৭ হিজরি সংখ্যা

[৭২] সূরাহ আল-ফুরকান, ২৫ : ৬৭

৩০,০০০, আর ঘড়ির দাম ৫০,০০০! দাম নিয়ে এ রকম পাগলামির কারণে অনেক মানুষ কেনাকাটার ভাবনা বাদ দিয়ে কেবল ঘোরাঘুরি করার জন্যই শপিং কমপ্লেক্সে যায়। এক নারী জানান, "আমি এখানে কেনাকাটা করতে আসি না। এমনি আইসক্রিম খাওয়া, কফি পান করা, বান্ধবীদের সাথে দেখা করা আর আমার বাচ্চাদের সাথে খেলাধুলা করতে আসি।" আরেকজন জানান, "এখানকার দাম অকল্পনীয়। আমি এখানে কেনাকাটার কথা ভাবতেও পারি না। খালি অবসর কাটাতে আর কফি পান করতে আসি।"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

> **"হে আদামসন্তান, প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সাজসজ্জা গ্রহণ করো, আর খাও, পান করো, কিন্তু অপচয় কোরো না। অবশ্যই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।"**[৭৩]

আমর ইবনু শুআইব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদার কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, "অপচয় বা অহংকার না করে খাও, পান করো, পরিধান করো এবং দান-সদকা করো।"[৭৪]

৬. ছোট ছোট দোকান বন্ধ হয়ে যাওয়া

বড় বড় শপিং সেন্টারের কারণে ছোট দোকানগুলোর ব্যবসা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। একজন দোকান মালিক জানান যে, এ রকম ছোট দোকানের পরিমাণ ৭৫% পর্যন্ত কমে গিয়েছে। মানুষ এগুলো ছেড়ে বড় শপিং কমপ্লেক্সে যায়, কারণ সেগুলো দেখতে লোভনীয় এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। সেই সাথে তাদের নানা রকম প্রচারণা, মূল্যছাড়, পুরস্কার, সময় কাটানোর সুযোগ-সুবিধা তো আছেই। এই সবকিছুর কারণে মানুষ ছোট দোকান ফেলে বড় কমপ্লেক্সের দিকে ছুটছে।

৭. মিথ্যে বিজ্ঞাপন

এই কমপ্লেক্সগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটির মিথ্যে বিজ্ঞাপন প্রচারের দুর্নাম আছে। মানুষ পণ্য কিনতে এসে আবিষ্কার করে যে স্টক শেষ হয়ে গেছে অথবা বিক্রি শেষ। অথবা পণ্যের গায়ে যে দাম লেখা থাকে, তার চেয়ে বেশি দাম রাখা হয়। এ ব্যাপারে সচেতন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। অথবা তারা খুব লোভনীয় করে

---

[৭৩] সূরাহ আল-আ'রাফ, ৭ :৩১

[৭৪] *ইবনু মাজাহ* : ৩৬০৫; *আহমাদ* : ২/১৮১। *আল-আমালিউল মুতলাকা* কিতাবের ৩২ পৃষ্ঠায় ইবনু হাজার ﵀ একে সহীহ বলেছেন।

পুরস্কারের ঘোষণা দেয়। পরে পুরস্কার তুলতে গেলে দেখা যায় সেগুলো সামান্য দামের জিনিস, যা তেমন প্রয়োজনীয়ও নয়।

দ্বিতীয়ত : ধর্মীয় ও নৈতিক সমস্যা

১. সময় অপচয়

এই শপিং কমপ্লেক্সগুলো সময় অপচয় করার আদর্শ জায়গা। মানুষ খোলামেলা জায়গা বা পার্কে সময় কাটানোর চেয়ে এসব শপিং মলে সময় কাটাতেই বেশি পছন্দ করে। সমাজবিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, অকাজে কাটানোর মতো অবসর সময় বেড়ে যাওয়ার সমানুপাতে অপরাধ ও নৈতিক অধঃপতনের মাত্রা বাড়তে থাকে। এর পেছনের কারণ হলো সময়ের গুরুত্বের ব্যাপারে উদাসীনতা। উদাসীনতা যত বাড়ে, ততই মানুষ এমন কাজে সময় ব্যয় করে যা কোনো উপকার করে না। আল-হাসান আল-বাসরি ﷺ বলেন,

> "হে আদাম সন্তান, তুমি তো কেবল কয়েকটি দিনের সমষ্টি মাত্র। একেকটি দিন কেটে যায়, সেই সাথে ক্ষয়ে যায় তোমার নিজেরই একেকটি অংশ।"[৭৫]

আমরা এক একটা দিন পার করতে পারলে খুশি হয়ে উঠি। অথচ এর মাধ্যমে আমরা মৃত্যুর কাছাকাছি যাচ্ছি কেবল।

উমার ﷺ বলেন,

> "আমি কোনো লোককে দেখে হয়তো প্রথমে পছন্দ করলাম। তারপর তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি যে তার কোনো বিশেষ দক্ষতা বা পেশা নেই। তখন আমি তার প্রতি সম্মান হারিয়ে ফেলি।"[৭৬]

তিনি আরও বলেন, "আমি তোমাদের এ রকম নিষ্কর্মা ও বেকার দেখতে অপছন্দ করি যে, তোমরা না দুনিয়ার জীবনের জন্য কিছু করছ, আর না আখিরাতের জীবনের জন্য।"[৭৭]

এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন, "কোনো অধিকার আদায় করে দেওয়া, কোনো কর্তব্য পালন করা, সম্মান অর্জন করা, প্রশংসা লাভ করা, কল্যাণকর নজির স্থাপন করা,

---

[৭৫] হিলইয়াতুল আউলিয়া : ২/১৪৮; সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪/৫৮৫

[৭৬] ইবনুল কুতাইবার *গারীবুল হাদীস* : ১/৩২১; আয-যামাখশারির *আল-ফায়িক* : ১/২৭৫

[৭৭] আবুল ফাযাল আন-নাইসাবুরির *মাজমাউল আমসাল* : ১/১৭২

অথবা জ্ঞান অর্জন করা ছাড়া অন্য কোনো কাজে যে ব্যক্তি দিন পার করল, সে সেই দিনের প্রতি দায়িত্বহীন আচরণ করল এবং নিজের আত্মার প্রতি অবিচার করল।”[৭৮]

ইয়াহইয়া ইবনু মুয়ায ﷺ বলেন,

> “ধোঁকা খাওয়া ব্যক্তি তো সে, যে নিষ্কর্মা দিন কাটায়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে ধ্বংসাত্মক গুনাহ করে, আর অপরাধ থেকে ফিরে আসার আগেই মারা যায়।”

দুনিয়া আপনার আখিরাতের শস্যক্ষেত্র। এখানে আপনি আজ যা বপন করবেন, কাল আখিরাতে সে অনুযায়ী ফসল পাবেন। আল্লাহর ইচ্ছায় ভালো গাছ থেকে ভালো ফল পাওয়া যাবে। বপনের মৌসুমে যে ঠিকমতো কাজ করে না, ফসল তোলার মৌসুমে তার আফসোস ছাড়া কিছু করার থাকবে না।

নবীজি ﷺ বলেন, “দুটি সম্পদ মানুষ হেলায় হারায়। সুস্বাস্থ্য ও অবসর সময়।”[৭৯]

তিনি ﷺ আরও বলেন,

> “বান্দার পা একচুলও নড়বে না, যতক্ষণ না সে এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে জবাবদিহি করে। তার জীবন, কোন পথে ব্যয় করেছে; অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে; তার সম্পদ, কীভাবে তা আয় ও ব্যয় করেছে; তার দেহ, কীভাবে তা ব্যবহার করেছে।”[৮০]

আল-ফুদাইল ইবনু ইয়ায ﷺ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনার বয়স কত?” লোকটি বললেন, “ষাট বছর।” আল-ফুদাইল বললেন, “ষাট বছর ধরে আপনি আপনার প্রতিপালকের দিকে যাত্রা করছেন। শীঘ্রই আপনি তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবেন।” লোকটি বললেন, “নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য আর তাঁর দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।”[৮১]

২. সালাত পরিত্যাগ করা

ওহে সালাত পরিত্যাগ করে শপিং কমপ্লেক্সে ঘুরে বেড়ানো ব্যক্তি! আল্লাহ যেদিন সালাতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, সেদিন আপনি কী জবাব দেবেন?

---

[৭৮] আদাবুদ দুনয়া ওয়াদ্দীন, ১/৫৭

[৭৯] *বুখারি* : ৬০৪৯

[৮০] *তিরমিযি* : ২৪১৭

[৮১] হিলইয়াতুল আউলিয়া : ৮/১১৩

সর্বপ্রথম যে বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে, তা হলো সালাত। আপনি কি বলবেন, বেচাকেনা আপনাকে ব্যস্ত করে রেখেছিল? যেখানে জিহাদের ময়দানেও সালাত থেকে ছাড় নেই, সেখানে বাজারে ঘোরাফেরা কী করে সালাত ত্যাগ করার অজুহাত হতে পারে?

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

> **"অতঃপর তাদের পর এল অপদার্থ পরবর্তীরা; তারা সালাত হারাল ও লালসার বশবর্তী হলো। তারা অচিরেই ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।"**[৮২]

৩. সম্মানহানি

এমন ঘটনা ঘটে ট্রায়াল রুমের কুখ্যাত ডাবল মিরর ব্যবস্থার মাধ্যমে। কিছু দোকানে এমনভাবে এসব রুম তৈরি করা হয় যে, নারীরা পোশাক পাল্টানোর সময় গোপনে ছবি তোলা হয়। পরে এসব ছবি বিক্রি করা হয়। তারপর এসব ছবি জায়গা করে নেয় ইন্টারনেটে। পাবলিক ওয়াশরুম, হোটেলরুম ইত্যাদি জায়গাতেও এসব অহরহ ঘটে। চোখের দেখায় বোঝা সম্ভব না ট্রায়াল রুমের আয়না কি সাধারণ আয়না, না ডাবল মিরর। ডাবল মিররে আপনি নিজেকে দেখবেন, কিন্তু আয়নার পেছন থেকে অন্য কেউ আপনাকে দেখতে পারবে। সাধারণ আয়নায় এমন হয় না। ডাবল মিরর চেনার উপায় হলো আয়নার উপর আঙুল রেখে দেখা। যদি আঙুল ও এর প্রতিবিম্বের মাঝে ফাঁকা দূরত্ব থাকে, তাহলে তা সাধারণ আয়না। আর যদি আঙুলের সাথে প্রতিবিম্ব একদম লেগে থাকে, তাহলে তা ডাবল মিরর।

এ রকম অসভ্য উপায়ে নারীদের শরীর দেখতে চেষ্টা করা লোকদের ব্যাপারে মিম্বরে দাঁড়িয়ে রাসূল ﷺ জোরগলায় বলেছেন,

> "ওহে সেইসব লোকেরা, যারা মুখে ঈমানের সাক্ষ্য দিয়েছ কিন্তু তা তোমাদের অন্তরে পৌঁছেনি! মুসলিমদের ক্ষতি কোরো না। তাদের অতীত গুনাহের কারণে তাদের গালাগালি ও তিরস্কার কোরো না। তাদের স্পর্শকাতর অঙ্গ ও দোষত্রুটি অনুসন্ধান কোরো না। কারণ, যে অপর মুসলিম ভাইয়ের দোষত্রুটি অন্বেষণ করে বেড়ায়, আল্লাহ্ তার দোষত্রুটি অন্বেষণ করেন। আর আল্লাহ্ যার দোষ অন্বেষণ করেন, তাকে তিনি লাঞ্ছিত করেই ছাড়বেন, যদিও সে আপন গৃহের ভেতর থাকে।"[৮৩]

---

[৮২] সূরাহ মারইয়াম, ১৯ : ৫৯

[৮৩] তিরমিযি : ২০৩২; সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তাহরীব : ২/২৯২

আল্লাহ্ তা’আলা বলেন :

> **“নিশ্চয় যারা পছন্দ করে যে মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতা প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।”[৮৪]**

৪. হারাম সাজসজ্জা, যৌনতার উসকানি ও মেলামেশা

সব ধরনের অশ্লীলতা শুরু হয় কেবল হারাম দৃষ্টিপাত এবং ফ্লার্ট করার মাধ্যমে। আর তা শেষ পরিণতি হলো যৌনক্রিয়ায় মাধ্যমে যিনার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছা। শপিং কমপ্লেক্স হলো ফাসিকদের সময় কাটানোর জায়গা, যেখানে তারা তাদের নোংরা উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে। এগুলো হারাম সম্পর্কের মিলনমেলাতেও পরিণত হয়েছে। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় মেয়েটি হয়তো বাবা-মাকে বলে বান্ধবীদের সাথে দেখা করার কথা। কিন্তু এসব জায়গায় এসে তারা প্রেম করা শুরু করে। কেউ দলবেঁধে এলেও পরে আলাদা হয়ে নিজ নিজ হারাম সঙ্গীর সাথে আলাদা আলাদা রেস্টুরেন্টে বসে যায়। আধুনিক ক্যাফে ও ফাস্ট ফুড রেস্টুরেন্টগুলোর বদৌলতে এসব শপিং কমপ্লেক্স হয়ে পড়েছে পাপাচারের চারণভূমি। সব পাপাচার শুরু হয় একে অপরকে নিজেদের দিকে আকর্ষণ করার মাধ্যমে, আর শেষ হয় লিটনের ফ্ল্যাট বা হোটেল রুমে। অনেক অভিভাবকই অবাধ মেলামেশার ব্যাপারে অভিযোগ করেন এবং এর সমাধান দাবি করেন। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, কিছু তরুণ-যুবক তাদের প্রেমিকাদের অভিভাবকদের সামনেই অশ্লীল ইঙ্গিত আদান-প্রদান ও কথাবার্তা বলে।

কোনো আশা নেই!

একজন নারী জানান, “একটি বড় মার্কেটে আমি ও আমার মেয়ে গিয়েছিলাম। এমন সময় এক অপরিচিত ছেলে এসে আমার সামনেই আমার মেয়েকে বলল, ‘আশা আছে, নাকি নেই?’ আমার মেয়ে নার্ভাস ভঙ্গিতে বলল, ‘না, কোনো আশা নেই।’ ছেলেটি নিরাশ হয়ে চলে যেতে লাগল। আমি তাকে ডাক দিয়ে বললাম, ‘তোমার এত বড় সাহস যে, কোনো মেয়ে তার পরিবারের সাথে থাকা অবস্থায়ও তুমি তাদের সাথে গিয়ে এভাবে কথা বলো? তাহলে আমার মেয়ের সাথে থেকে আমার লাভটা কী হলো? এটা তো বিরাট বেয়াদবি, কারও বাড়ির মেয়েদের প্রতি অসম্মান। এটা তাদের শালীনতা ও লজ্জাশীলতার বিরুদ্ধে আক্রমণ। একদিন দেখবে তোমার বাড়ির মেয়েদের সাথেও অন্যেরা এমন আচরণ করছে। তখন তোমার কেমন লাগবে?’ অনেক মানুষ এ ঘটনার দিকে তাকিয়ে ছিল। ছেলেটি বিব্রত হয়ে সেখান থেকে সরে গেল।”

---

[৮৪] সূরাহ আন-নূর, ২৪:১৯

তরুণ-যুবকদের মাঝে এসব কর্মকাণ্ডের বিস্তার সম্পর্কে প্রায়ই শোনা যায়। আর এ রকম নোংরামি যদি বিবাহিত ও বয়স্কদের মাঝেও ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে এটা আরও বড় দুঃসংবাদ। এমনকি তাদের মধ্যে অনেকে স্ত্রী-সন্তানের সামনেও পরনারীর দিকে তাকিয়ে থাকতে দ্বিধা বোধ করে না। চাই কি তারা ওই সব নারীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাও দিয়ে দিতে পারবে!

একজন নারী বলেন, “একবার আমি এক শপিং মলে গিয়ে ডিনারের জন্য বসলাম। আমি আমার বাবার বয়সী এক লোকের মুখোমুখি বসেছিলাম। তার সাথে তার ছেলেও ছিল। আমি বসামাত্র তিনি আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।”

এটা তো কেবল একটি উদাহরণ। শরয়ী পর্দা লঙ্ঘন করে এসব জায়গায় এমন আরও কতকিছু যে করা হয়, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েরাও কম বয়সের দোহাই দিয়ে বেপর্দা হয়ে ঘুরে বেড়ায়, গায়রে মাহরামদের সাথে অবাধে মেলামেশা করে।

আমাদের উচিত যথাসম্ভব আল্লাহকে ভয় করার মাধ্যমে নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন :

> **“মুমিনদের বলো তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে, এটাই তাদের জন্য বেশি পবিত্র, তারা যা কিছু করে সে সম্পর্কে আল্লাহ খুব ভালোভাবেই অবগত। আর ঈমানদার নারীদের বলে দাও তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে, আর তাদের শোভা-সৌন্দর্য প্রকাশ না করতে—যা এমনিতেই প্রকাশিত হয় তা ব্যতীত।”**[৮৫]

পুরুষের পাশাপাশি অনেক নারীদেরও আজকাল এ সকল শপিং মলের ক্যাফেতে ধূমপান করতে দেখা যায়। আল্লাহু মুস্তা’আন!

আর ব্লুটুথের কথা তো বলাই বাহুল্য। এইসব শপিং কমপ্লেক্সে একে অপরের সাথে অশ্লীল ভিডিও আদান-প্রদান করাটা তো ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একজন নেককার ব্যক্তি বলেন, “আমি এ রকম একটা কমপ্লেক্সে দাওয়াহর নিয়্যাতে গিয়েছিলাম। আমি ব্লুটুথের মাধ্যমে বেশ কিছু দাওয়াহ ম্যাটেরিয়াল সেন্ড করলাম। দেখলাম যে বেশির ভাগ ব্লুটুথ ডিভাইসেরই অশ্লীল অশ্লীল সব নাম।”

---

[৮৫] সূরাহ আন-নূর, ২৪ : ৩০-৩১

যেসব পদ্ধতিতে মানুষ পাপাচারের দিকে অগ্রসর হয়

প্রায় ৯০% ক্ষেত্রেই বিষয়টা শুরু হয় ব্লুটুথের মাধ্যমে, নিজের অশ্লীল ডাকনাম ঠিক করা এবং সেটা দেখানোর মাধ্যমে বা নিজের নম্বর দিয়ে রেখে অথবা অশ্লীল কাপড় পরিহিত ছবি দিয়ে।

মার্কেটে হারাম সম্পর্কের কারণ

১। অবসর সময় ও বেকারত্ব।

২। অসৎ সঙ্গ।

৩। ধর্মীয় অনুশাসনের অভাব বা শিথিলতা।

৪। লজ্জাশীলতার অভাব।

৫। পিতামাতার শাসনের অভাব।

৬। পুরুষত্বের আসল গুণ না জানা তরুণ-যুবক। এরা নিজেদের লজ্জাস্থান হেফাজতের গুরুত্বও বোঝে না। আপন বোনকে যেসব বিষয় থেকে নিরাপদ রাখতে চায়, অন্য মুসলিম বোনের সেসব থেকে নিরাপত্তার কথা ভাবে না। সে অন্যের মেয়েদের যে অবস্থায় দেখতে চায়, নিজের বোনকে কখনোই সে অবস্থায় দেখার কথা ভাবতেও পারবে না।

৭। স্যাটেলাইট চ্যানেল দেখে শেখা বেহায়াপনা ও পাপাচার।

৮। অভিভাবকদের দায়িত্বহীনতা। এর ফলে নারীরা মাহরাম ছাড়া ঘর থেকে বের হয় এবং রোগাক্রান্ত অন্তরবিশিষ্ট লোকদের দৃষ্টির শিকার হয়।

৯। নৈতিকতা না শিখিয়েই কমবয়সী সন্তানের হাতে স্মার্ট ফোন, কম্পিউটার, ব্লুটুথ তুলে দেওয়া।

১০। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ﵄ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই এ দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। কোনো জাতির নেতা সে ব্যাপারে দায়িত্বশীল। পুরুষ তার পরিবারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। নারী তার স্বামীর বাড়ি ও সন্তানদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। দাস তার মনিবের সম্পদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।”[৮৬]

---

[৮৬] *বুখারি*: ৫১৮৮; *মুসলিম*: ১৮২৯

১১। বেদ্বীন লোকেরা সমাজের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে আর দ্বীনি পরামর্শদাতার সংখ্যা কমে গেছে। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারীরা এসব জায়গায় খুব কম থাকে। থাকলেও তারা কোনো না-কোনো পাপাচারী বা অজ্ঞ লোকের আক্রমণের আশঙ্কায় থাকে। ফলে এসব জায়গা অনৈতিক কাজকর্মকারীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়।

দোকানদারদের দুঃসাহস

নতুন নতুন মডেলের পণ্য সম্পর্কে খবর দেওয়ার অজুহাতে নারীদের ফোন নম্বর রেখে দেয় কিছু দোকানদার।

একজন নারী জানান, “আমি ও আমার মেয়ে একবার দোকানে গেলাম, দুজনই পর্দানশীল। আমরা ব্লাউজের রং পছন্দ করতে লাগলাম। তখন দোকানদার বলল, ‘মেয়েটির গায়ের রঙের সাথে এটি ভালো মানায়।’ আমি সেটি তার দিকে ছুড়ে মেরে দুজনই দ্রুত সেখান থেকে চলে যাই।”

আরেকজন জানান, “আমি আমার মেয়েসহ কেনাকাটা করছিলাম। পূর্ণ পর্দা করা ছিলাম। দোকানদার যখন আমাকে পছন্দের স্কার্ট দেখাচ্ছিল, সে অসৎ উদ্দেশ্যে আমার আঙুল স্পর্শ করল। আমি কান্না করতে করতে সেখান থেকে চলে গেলাম।”

তৃতীয় আরেকজন জানান, “আমি আমার স্বামীর সাথে দোকানে গেলাম। দোকানদার আমাদের এমন সব পোশাক দেখাতে লাগল, যাতে শরীর দেখা যায়। খুব আকর্ষণীয় করে সে সেসব টেবিলের উপর রাখতে লাগল। আমরা এতে প্রচণ্ড বিব্রত হয়ে যাই। আমার স্বামী আমাকে সেখান থেকে টেনে বের করে নিয়ে যায়।”

নারী নিজেও দোকানে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য দায়ী হতে পারে। হয়তো সে একা বা গায়রে মাহরাম পুরুষের সাথে বের হয়েছে, অথবা টাইট পোশাক ও সাজসজ্জা করেছে, সুগন্ধি মেখেছে। এর ফলে দুষ্ট লোকেরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।

এক বিক্রেতা জানান, “শালীন নারীদের তো পোশাক দেখেই বোঝা যায়। আর পাপাচারী নারীরা দোকানে ঢুকলেই তাদের সাজসজ্জা আর সুগন্ধির মাধ্যমে নিজেদের পাপাচারিতার ঘোষণা দেয়। এক নারী একবার আমাদের দোকানে এসে জিনিসপত্র দেখতে দেখতে অযথা আলাপচারিতা আর হাসাহাসি করতে লাগল। এমনকি আমাদের এক ক্রেতার গায়েও হেলান দিয়ে বসল। আমি তাকে জোর করে দোকান থেকে বের করে দিই।”

আরেক নারী জানান, “আমি যদি বলি আমি এখানে আসতে ভালোবাসি যাতে দুষ্ট লোকেরা আমাকে অনুসরণ করে আর অশ্লীল কাজে আহ্বান জানাতে পারে, তাহলে হয়তো কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না।”

হারাম উপায়ে সৌন্দর্য প্রদর্শনের হাজারটা পথ আছে

নজরকাড়া ডিজাইনের কারুকার্য করা কাপড়।

চেহারা ও শরীরের অন্যান্য আকর্ষণীয় অঙ্গ উন্মুক্ত রাখা।

“মার্কেট মেকআপ” নামে পরিচিত জিনিসটি ব্যবহার করা, যা মুখের উপরের অংশের সৌন্দর্য বাড়াতে কাজে লাগে, যাতে নেকাব পরেও সৌন্দর্য প্রকাশ করা যায়।

কিছু নারী সুগন্ধি মেখে বের হয়। অথচ রাসূল ﷺ বলেছেন, “কোনো নারী যদি সুগন্ধি মেখে লোকেদের পাশ দিয়ে যায় যাতে তারা তার গন্ধ পায়, তাহলে সে ব্যভিচারিণী।”[৮৭]

দোকানদারের সাথে একাকী অবস্থান করা। রাসূল ﷺ বলেছেন, “কোনো নারীর সাথে একাকী অবস্থান কোরো না। কারণ, তখন তৃতীয় ব্যক্তি হয় শয়তান।”[৮৮]

তিনি ﷺ আরও বলেন, “আমি পুরুষের জন্য নারীর চেয়ে বড় কোনো ফিতনা রেখে যাচ্ছি না।”[৮৯] পরীক্ষার বস্তু আর পরীক্ষিতকে তাহলে কী করে একসাথে রাখা সম্ভব?

নারী ও পুরুষের উপর ফরয হলো আল্লাহকে ভয় করা এবং একে অপরের সাথে মেলামেশা না করা। রাসূল ﷺ রাস্তায় নারী-পুরুষের মিশ্রণ হতে দেখে নারীদের বলেছিলেন, “একটু দেরি করো। আর রাস্তার মাঝখান তোমাদের অধিকার নয়। তোমরা অবশ্যই ধার ঘেঁষে চলবে।” তারপর থেকে মুমিন নারীরা দেয়ালের এমন ধার ঘেঁষে চলা শুরু করেন যে কখনো তাঁদের কাপড় দেয়ালে আটকে যেত।[৯০]

---

[৮৭] *আন-নাসাঈ* : ৫১৪১; শাইখ আলবানি *সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব* : ২/২১৬ গ্রন্থে একে হাসান বলেছেন।

[৮৮] *আহমাদ* : ১/১৮; শাইখ শুআইব আরনাউত এর সনদকে সহীহ বলেছেন।

[৮৯] *মুসলিম* : ২৭৪০

[৯০] *আবু দাউদ* : ৫২৭২; *আস-সিলসিলা আস-সহীহা* : ২/৫৩৬ গ্রন্থে শাইখ আল-আলবানি একে হাসান বলেছেন।

মাসজিদের মতো পবিত্র জায়গায় যেখানে নারী-পুরুষেরা কামনা-বাসনা থেকে সবচেয়ে দূরে থাকে, সেখানেই এই ব্যবস্থা। তাহলে অন্য জায়গায় কতটা কঠোর হওয়া উচিত?

নিঃসন্দেহে একই জায়গায় নারী-পুরুষের মেলামেশা ও বেপর্দা হওয়া নিষিদ্ধ। কারণ, এর ফলে হারাম কামনা-বাসনা জেগে ওঠে। এগুলো অশ্লীলতা ও পাপাচারে সহায়ক।

এ সকল মেলামেশা রোধ করতে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া যায়

১। নারী-পুরুষের স্থান পৃথক করে দেওয়া।

২। নারী-পুরুষের জন্য আলাদা আলাদা দরজার ব্যবস্থা করা।

৩। কোনো বিশেষ ঘোষণা বা বিবৃতি কিংবা জন্য আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো।

সুস্থ বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন কেউই বলবে না কাপড় না ভিজিয়ে পানির মধ্যে থাকতে বা পুড়ে না গিয়ে আগুনে দাঁড়িয়ে থাকতে। নারী-পুরুষের বেপর্দা মেলামেশার অনেক কুফল রয়েছে। যেমন :

- নারীর খোলা মুখমণ্ডল দেখে পুরুষের ফিতনায় আপতিত হওয়া।

- নারীর নিজের লজ্জাশীলতা লোপ পাওয়া।

- মুখমণ্ডল প্রদর্শনই যেখানে ঠিক নয়, সেখানে অনেকে গলা বা হাত-পা উন্মুক্ত করে দেয়। কেনাকাটা করতে গিয়ে অনেকে জামার হাতা গুটিয়ে ফেলে।

শিশু-কিশোরদের জন্য ভিডিও গেইমসের ক্ষতি

প্রায় সব শপিং সেন্টারে বাচ্চাদের জন্য ভিডিও গেইমসের ব্যবস্থা থাকে। বেশির ভাগ গেইমসই থাকে রেসিং গেইমস কিংবা ফাইটিং গেইমস। এখানে মারপিট, রক্তারক্তিসহ নানা রকম পাপাচার দেখানো হয়। খুবই বাস্তবধর্মী গ্রাফিক্সের কারুকাজে বাচ্চাদের মনে এসব নোংরা বিষয় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এসব গেইমসে অন্যের গাড়ি বা টাকাপয়সা চুরি করা, গাড়িচাপা দিয়ে মানুষ মেরে ফেলা, পুলিশের গাড়িতে ধাক্কা দেওয়া, পুলিশ থেকে পালিয়ে বেড়ালে পয়েন্ট বাড়তে থাকে। তাহলে চিন্তা করুন এসব গেইমস থেকে আমাদের বাচ্চারা কেমন বার্তা পাচ্ছে?

হারাম পণ্যের বেচাকেনা

দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক যেসব বিষয় শপিং কমপ্লেক্সে সংঘটিত হয়, তাদের মধ্যে আরেকটি হলো হারাম পণ্যের বেচাকেনা। যেমন : অ্যান্টিক শপগুলোতে বিক্রি হওয়া মূর্তি, ভাস্কর্য ইত্যাদি।

ফাতওয়া কমিটির মতানুযায়ী, প্রাণীর ছবিযুক্ত পণ্যের বেচাকেনা হারাম। সহীহ হাদীসে আছে রাসূল ﷺ বলেছেন, "মদ, মৃত পশু, শূকর ও প্রতিমার বেচাকেনা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হারাম করেছেন।"[৯১]

প্রাণীর ছবি খোদাই করা জিনিস যদি কোনো ব্যবহারিক উদ্দেশ্য ছাড়া কেবল দেয়ালে ঝোলানো বা এ রকম কোনো উদ্দেশ্যে আদান-প্রদান করা হয়, তাহলে তা হারাম; হোক তা সোনা, রুপা, কয়েন, কাপড় বা মেশিন। এটি প্রতিমার বেচাকেনা হারাম হওয়ার বিধানের অধীনে পড়বে। কিন্তু পণ্যটি যদি কোনো ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, যেমন কাটিং মেশিন, পাপোশ, হেলান দেওয়ার কুশন, সে ক্ষেত্রে তা জায়েয। আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একবার ছবিযুক্ত একটি পর্দা আলমারিতে ঝোলালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা দেখতে পেয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। আয়িশা رضي الله عنها সেটি দিয়ে দুটি কুশন তৈরি করেন, যা রাসূল ﷺ-এর বসার জন্য আমাদের ঘরে রয়ে যায়। ইমাম আহমাদ رحمه الله-এর বর্ণনায় এসেছে আয়িশা رضي الله عنها বলেন, "আমি সেই পর্দা ছিঁড়ে দুটি কুশন তৈরি করলাম। আমি রাসূলুল্লাহকে একটি কুশনে হেলান দিয়ে বসতে দেখেছি যার গায়ে ছবি আঁকা ছিল।"[৯২]

স্বর্ণের আংটি ও ঘড়ির ব্যাপারে বিধান হলো, পুরুষদের পরিধানের জন্য এগুলো বিক্রয় করা হারাম।

যারা বলেন যে এসব জিনিস কেবল অমুসলিম ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করা হয়, তাঁদের এ অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষ করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে তো নয়ই। কারণ, বেচাকেনা হতে হবে ইসলামী শরিয়তের নিয়ম মেনে। না হলে তো কাফিরদের কাছে বিক্রির উদ্দেশ্যে মদের ব্যবসাও জায়েয হয়ে যেত![৯৩]

---

[৯১] *বুখারি* : ২১২১; *মুসলিম* : ১৫৮১

[৯২] *মুসলিম* : ২১০৭; *আহমাদ* : ৬/২৪৭; *ফাতাওয়া আল-লাজনা আদ-দাইমাহ* : ১৩/৭৩-৭৫ দ্রষ্টব্য

[৯৩] ফাতওয়া আল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ : ১৩/৬৮-৬৯-৭৩

নারীদের হারাম পোশাক বিক্রি

নারীদের এমন পোশাক যা ইসলামী শরিয়তের বিরুদ্ধে যায়, এসবের বেচাকেনাও আজ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন : সতর উন্মুক্ত থাকে এ রকম পোশাক, খারাপ কথা লেখা পোশাক। এমনকি কিছু কাপড়ে শির্কি কথাও লেখা থাকে।

নারীদের পোশাক বিক্রয়ের বিধান

নারীদের যেসব পোশাক বিক্রি হয়, তা তিন প্রকারের হতে পারে :

১। বিক্রেতা নিশ্চিত বা প্রায় নিশ্চিতভাবে জানে যে, ক্রেতা এই পোশাক কিনে কেবল হালাল কাজে ব্যবহার করবে, হারাম কাজ করবে না। এ ক্ষেত্রে পোশাক বিক্রি সম্পূর্ণ জায়েয।

২। বিক্রেতা নিশ্চিত বা প্রায় নিশ্চিত যে, ক্রেতা এই পণ্য হারাম কাজে ব্যবহার করবে। যেমন : বেপর্দা হয়ে পরপুরুষের সামনে যাওয়া। সে ক্ষেত্রে বিক্রয় হারাম হবে। আল্লাহ বলেন :

> **“আর সৎ কাজ ও আল্লাহভীতির ব্যাপারে পরস্পরকে সহযোগিতা করো। কিন্তু পাপাচার ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অপরকে সহযোগিতা কোরো না।”[৯৪]**

একই কাপড় হালাল ও হারাম উভয় কাজেই ব্যবহৃত হতে পারে। ক্রেতা নারীটি যদি পর্দানশীল হন অথবা দেশের আইনে যদি পর্দা করা বাধ্যতামূলক হয়, তাহলে কাপড়টি হারাম কাজে ব্যবহৃত না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সে ক্ষেত্রে তা বিক্রি করা জায়েয।

৩। পোশাকটি হালাল কাজে ব্যবহৃত হবে নাকি হারাম কাজে ব্যবহৃত হবে, তা নিয়ে বিক্রেতা সন্দিহান। সে ক্ষেত্রে বিক্রি জায়েয হবে। কারণ, সাধারণভাবে বেচাকেনা জায়েয। “কিন্তু আল্লাহ ব্যবসাকে করেছেন হালাল আর সুদকে করেছেন হারাম।”[৯৫]

শুধু ক্রেতার দায়িত্ব হলো পোশাকটি হারাম উপায়ে ব্যবহার না করা।

---

[৯৪] সূরাহ আল-মায়িদাহ, ৫ : ২

[৯৫] সূরাহ আল-বাকারাহ, ২ : ২৭৫

নারী আকৃতির ম্যানিকুইন

ম্যানিকুইন তৈরি করা প্রাণীর প্রতিকৃতি তৈরি করাই নামান্তর। এটি হারাম হওয়ার বিধানের অধীনে পড়ে। কাজেই তা হারাম। কিন্তু যদি ম্যানিকুইনের মাথা না থাকে, তাহলে তা প্রতিকৃতি হিসেবে গণ্য হবে না। সে ক্ষেত্রে তা তৈরি করা ও তা থেকে উপকৃত হওয়া হারাম নয়। তবে শর্ত হলো অন্য কোনো হারাম কাজে এগুলো ব্যবহার না করা।

কিন্তু কিছু নারী আকৃতির ম্যানিকুইন আছে, যা খুবই আকর্ষণীয় করে নারীদেহের আকৃতিতে তৈরি করা হয়, যাতে পোশাকগুলো লোভনীয় লাগে। নারী-পুরুষ উভয়ই এসব দোকানে যাতায়াত করে এবং এসবের কারণে ফিতনায় আপতিত হয়।

এক তরুণ জানান, “এসব ম্যানিকুইন আমার খুবই বিরক্ত লাগে। মনে হয় যেন আমি একদল উলঙ্গ নারীর মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। আমি দ্রুত এসব জায়গা পার হয়ে যাই।”

আরেক তরুণী জানান, “নারীদের পোশাক ডিসপ্লে করে রাখা জায়গাগুলো দিয়ে যাওয়ার সময় আমার খুবই বিব্রত বোধ হয়। বিশেষ করে অন্তর্বাস ডিসপ্লে করা হয় যেসব জায়গায়। আমার কাছে মনে হয় যেন একজন জীবন্ত নারী আমার সামনে অন্তর্বাস পরে দাঁড়িয়ে আছে। এগুলো আমাদের সংস্কৃতিরও বিরোধী।”

একজন শিক্ষা গবেষক বলেন, “বিশেষ করে দেহাকৃতি-বিশিষ্ট ছবি উভয় লিঙ্গের তরুণদের উপর স্পষ্ট প্রভাব ফেলে। সাইকোলজিস্ট ও এডুকেটররা একমত যে, নারীর দৈহিক সৌন্দর্য প্রদর্শন করা সকল ছবিই তরুণ-তরুণীদের উপর মানসিকতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এর ফলে লজ্জাশীলতা ও শালীনতা লোপ পায়। এসব ছবিতে এমনভাবে দেহের সব বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়, যা কেবল বেডরুমে সঙ্গীকেই দেখানো উচিত। অথচ এসব ছবি পাবলিক ডিসপ্লের জন্য রাখা হয়।”

বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের বিধান

১। কারও ক্ষতি করে এমন বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে না। কারণ, এর ফলে মুসলিমদের মাঝে ঘৃণা, শত্রুতা ও হিংসা ছড়িয়ে পড়ে।

২। বিজ্ঞাপনে মিথ্যা কথা প্রচার করা যাবে না। এমন করা হলে হারাম উপায়ে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করা হবে। এর ফলে সম্পদ থেকে বরকত চলে যায়।

বিজ্ঞাপন হতে হবে বাস্তবসম্মত। পণ্যের দোষ-গুণের ব্যাপারে কোনো কিছু বাড়িয়ে-কমিয়ে বলা যাবে না।

৩। বিজ্ঞাপনে হারাম কিছু প্রচার করা হবে না। যেমন : মদ, জুয়া, লটারি, ধূমপান।

৪। ইসলামের কোনো মৌলিক বিধানকে খাটো করে, এমন জিনিস বিজ্ঞাপনে থাকতে পারবে না। এ ছাড়া মুসলিমদের অপমান করে, এ রকম বিষয়ও থাকতে পারবে না।

৫। কোনো প্রাণীর ছবি (যেমন : মানুষ, পশু, পাখি) থাকতে পারবে না।

৬। নারীর দেহ বা দেহের কোনো অংশের ছবি বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা যাবে না। নারীর দেহ কেবলই তার ব্যক্তিগত গোপন স্থান। বিজ্ঞাপনে নারীদেহের ব্যবহার তাদের জন্য অপমানজনক, তাদের জন্য অসম্মানের এবং সমাজকে পাপাচারের দিকে প্রলুব্ধকারী।

৭। বিজ্ঞাপন প্রচারে সততার পরিচয় দিতে হবে।

৮। অন্য কোনো পণ্যকে অসম্মান বা খাটো করা যাবে না। যথাযথ অধিকার ছাড়া অন্য পণ্যের বিক্রেতাদের ক্ষতি করা যাবে না। রাসূল ﷺ বলেন, "তোমরা ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, ভাইয়ের জন্যও অনুরূপ পছন্দ করে।"[৯৬] তিনি ﷺ আরও বলেন, "নিজের বা অন্যের ক্ষতি করা যাবে না।"[৯৭]

প্রচারণামূলক পুরস্কারের বিধান

(এ অংশটি ডক্টর খালিদ আল-মুসলিহ রচিত *আল-হাওয়াফিযুত তিজারিয়্যাহ আত-তাওসিকিয়্যাহ* কিতাব থেকে গৃহীত)

প্রচারণামূলক পুরস্কারের বিধান জানা ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের জন্যই সমান গুরুত্বপূর্ণ। পণ্যের প্রচারণা ও ক্রেতাকে তা কিনতে আকর্ষণ করার জন্য যেসব পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, সবই এর অন্তর্ভুক্ত। পণ্য বা সেবাটি ক্রয় করার জন্য ক্রেতাদের উদ্বুদ্ধ করার এসব পদ্ধতি এখন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আগে এ বিষয়টা তেমন প্রচলিত ছিল না।

---

[৯৬] *বুখারি* : ১৩; *মুসলিম* : ৪৫

[৯৭] *ইবনু মাজাহ* : ২৩৪০; *ইরওয়াউল গালীল* : ৩/৪১৩ কিতাবে শাইখ আল-আলবানি একে সহীহ বলেছেন।

সভ্যতা ও উৎপাদন ব্যবস্থা যত অগ্রসর হয়েছে, ততই নতুন নতুন মেশিন ও পণ্য আবিষ্কার হয়েছে। ব্যবসায়ীদের পণ্য ও সেবার প্রচারণার মাধ্যম ও পদ্ধতির ভিত্তিতেই এখন মানুষের জীবন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। বিপুলসংখ্যক ভোক্তাকে নিজেদের পণ্যের দিকে আকৃষ্ট করতে ক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের মাঝে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। এর ফলে তাদের পণ্য প্রচারের জন্য তারা নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে, যাতে বেশিসংখ্যক ক্রেতা ভেড়াতে পারে।

অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, বড়-ছোট প্রায় সকল মার্কেট, শপিং সেন্টার নানা রকম প্রচারণামূলক পুরস্কারের ঘোষণায় সর্বদা জমজমাট থাকে। মার্কেটের কর্মকাণ্ড বা আকার যাই হোক না কেন, নির্বিশেষে এসব প্রচারণামূলক পুরস্কার তাদের জন্য এক মাইলফলক হয়ে দাঁড়ায়। প্রত্যেকেই এই পদ্ধতি ব্যবহার করে ক্রেতাদের অন্য বিক্রেতার কাছ থেকে নিজেদের কাছে ভাগিয়ে আনতে চায়। এ জন্য তারা উপহার, প্রতিযোগিতা, মূল্যছাড়, ঘোষণা, বিজ্ঞাপন, ওয়ারেন্টি ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করে।

এই প্রতিটির ব্যাপারে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

উপহার

ভোক্তা ও ক্রেতাদের বিনামূল্যে দেওয়া জিনিস এর অন্তর্ভুক্ত। তাদের পণ্য বা সেবা ক্রয় করতে উৎসাহিত করার জন্য বোনাস হিসেবে এটি দেওয়া হয়। এর নানা রকম প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন : কোনো নির্দিষ্ট পণ্য কিনলে তার সাথে অন্য পণ্য ফ্রি। বা কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণের পণ্য কিনলে তার সাথে আরও কিছু পরিমাণ ফ্রি। অথবা নির্দিষ্ট দামের পণ্য কিনলে আরও কিছু দামের পণ্য ফ্রি। যেমন : এক কার্টন দুধ কিনলে একটি গ্লাস ফ্রি দেওয়া অথবা নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্রিম কিনলে নির্দিষ্ট পরিমাণ মধু ফ্রি দেওয়া।

এ ধরনের উপহার প্রদান জায়েয।

আর কিছু ধরনের উপহার আছে যেখানে বিক্রেতা পণ্যের ভেতর স্বর্ণ, রৌপ্য বা পেপার গিফট রাখে, যাতে ক্রেতা তা ক্রয় করতে উদ্বুদ্ধ হয়। অথবা অনেকগুলো পণ্য কিনে পাজল মেলাতে পারলে উপহার দেওয়া হয়। একেকটি প্যাকেটে হয়তো পাজলের একটা একটা অংশ থাকে। এভাবে সবগুলো মিলিয়ে একটি গাড়ি বা ফোনের ছবি দাঁড়ায় এবং তা জমা দিয়ে উপহার নিতে হয়।

নিম্নলিখিত কারণে এ ধরনের উপহার প্রদান নিষেধ :

১। এটি হলো এক ধরনের জুয়া, যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষিদ্ধ করেছেন। এই ধরনের পদ্ধতিতে বেশির ভাগ ক্রেতাই ওই পণ্যটির চেয়ে উপহারটির প্রতি বেশি আগ্রহী থাকে। ফলে পণ্য কেনার মাধ্যমে আসলে জুয়ার মতো করে টাকা ঢালে। আর এভাবে টাকা ঢালার পর উপহারটি না জেতার অর্থ হলো লোকসানের মুখোমুখি হওয়া। এভাবে এক পক্ষের লাভ ও অপর পক্ষের লোকসান জুয়ার বৈশিষ্ট্য।

২। ইসলামী অর্থনীতিতে এ ধরনের বিক্রয়কে রিস্ক সেল বলা হয়। ক্রেতা জানে না চুক্তি পূর্ণ হওয়ার পর সে কী পাবে—উপহার, নাকি শুধু পণ্য।

৩। এ ধরনের অফারের ফলে মানুষ এমন জিনিস ক্রয় করতে উদ্বুদ্ধ হয়, যা তাদের দরকার নেই। এটি অপচয় এবং হারাম। এর ফলে অযথা সম্পদ বিনষ্ট হয়।

প্রচারণামূলক প্রতিযোগিতা

কোনো নির্দিষ্ট দোকান বা পণ্যের দিকে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার জন্য এটি ব্যবসায়ীদের বহুল ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি। এ সকল প্রতিযোগিতার দিকে আকৃষ্ট হয়ে অসংখ্য ক্রেতা চ্যাম্পিয়ন হওয়া বা প্রাইজ জেতার আশায় সেই পণ্য বা দোকানের দিকে ছুটতে শুরু করে। এসব প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ক্রেতাদের কখনো কখনো কুইজে অংশ নিতে হয়। সাধারণ জ্ঞান বা ওই পণ্যসংক্রান্ত কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। আবার কিছু ক্ষেত্রে র‍্যাফেল ড্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেক ক্রেতাকে নির্দিষ্ট নম্বরের কার্ড দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট দিনে লটারি করে যাদের নম্বর হাতে উঠে আসে, তারা পুরস্কার পায়। এ ধরনের প্রতিযোগিতার সহজতার কারণে অনেক জায়গায় এটি ব্যবহৃত হয়।

এ ধরনের প্রতিযোগিতার বিধান

পণ্য ক্রয় করা যদি শর্ত না হয়, অর্থাৎ যারাই দোকানে যায় তারাই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে বা র‍্যাফেল ড্রয়ের কার্ড সংগ্রহ করতে পারে, তাহলে তা হালাল হবে। কারণ, সাধারণ বিধান হলো সকল ধরনের ব্যবসা-লেনদেন জায়েয, যদি না তাতে কোনো সুদি লেনদেন, প্রতারণা, হারাম ঝুঁকি ইত্যাদি থাকে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আর যদি পণ্য ক্রয় করা শর্ত হয়, তাহলে এর ব্যাপারে আলিমগণের মতপার্থক্য আছে। কেউ একে সম্পূর্ণ হারাম বলেছেন। যেমন : শাইখ বিন বায রহিমাহুল্লাহ (*ফাতাওয়া*

ইসলামিয়্যাহ: ৪/৪৪৩) প্রমুখ। কেউ একে শর্তসাপেক্ষে হালাল বলেছেন। যেমন: শাইখ ইবনু উসাইমীনের মতে এটি দুটি শর্তে জায়েয হবে।

প্রথমত, পণ্যের দাম অপরিবর্তিত থাকতে হবে। অর্থাৎ, পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেওয়া যাবে না। তখন মানুষ পুরস্কারের আশায় বেশি টাকা খরচ করে পণ্য ক্রয় করবে। পুরস্কার জিতলে লাভ, না জিতলে লোকসান। ফলে তা জুয়া হিসেবে গণ্য হবে।

দ্বিতীয়ত, শুধু পুরস্কার পাওয়ার আশায় পণ্য ক্রয় করা যাবে না। ক্রেতা যদি শুধু পুরস্কারটিই চায় আর মূল পণ্য থেকে কোনো উপকার লাভের ইচ্ছা না রাখে, তাহলে সেই পণ্য ক্রয় করা অপচয় বলে গণ্য হবে। অনেক ক্রেতাই সেই পণ্য কিনে দোকানের ভেতরেই বা ঘরে ফিরে তা ব্যবহার না করে ফেলে দেয়। রাসূল ﷺ অর্থ অপচয় করতে নিষেধ করেছেন।[৯৮]

মূল্যছাড়

এ ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও অধিকাংশ আলেমের মত হলো এটি জায়েয। মালিকি মাযহাবের আলিমগণ একে হারাম বলে থাকেন। তবে শক্তিশালী মত হলো এই যে, বাজারমূল্যের চেয়ে কম দামে পণ্য বিক্রি জায়েয। কারণ, ব্যবসায়িক লেনদেন হয়ে থাকে উভয় পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে। তবে মূল্যছাড়ের মাধ্যমে যদি প্রতারণা, অন্য বিক্রেতাদের ক্ষতি করা, কিংবা অন্য কোনো হারাম নিয়্যাত থাকে, তাহলে পাপকাজের পথ রুদ্ধ করার বিধানের অধীনে এ ধরনের মূল্যছাড় হারাম হবে। কিছু কোম্পানি কিছু ক্রেতাদের বছর বা মাসের পণ্য ক্রয়ের বিনিময়ে ডিসকাউন্ট কার্ড দেয়, কারণ চুক্তিতে ডিসকাউন্টের পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য উভয় পক্ষের জানা আছে। এ ধরনের ডিসকাউন্টে লাভও হতে পারে, লোকসানও হতে পারে। এই ঝুঁকির কারণে অনেকে ডিসকাউন্ট কার্ডের বিনিময়ে কোনো কিছুই পায় না। এ ছাড়া এসব কার্ড ক্রেতাদের প্রতারিত করে অথবা জোর করে তা নিয়ে বাধ্য করা হয়। যেসব ডিসকাউন্টের কথা বলা হয়, তার কোনো কোনোটি বাস্তবে দেওয়া হয় না। তবে যদি পণ্য ক্রয় করার বিনিময়ে পুরস্কার হিসেবে বা উৎসাহিত করতে ডিসকাউন্ট কার্ড দেওয়া হয়, তাহলে তা জায়েয হবে।

---

[৯৮] *বুখারি*: ১৪০৭; আরও দেখুন *লিকাউল বাবুল মাফতুহ* গ্রন্থে ইবনু উসাইমীনের এ সংক্রান্ত আলোচনা।

ওয়ারেন্টি

এর অর্থ হলো উৎপাদনকারী বা তার প্রতিনিধি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই পণ্যে কোনো উৎপাদনগত বা কারিগরি ত্রুটি না হওয়ার গ্যারান্টি দেয়। এই সময়ের মধ্যে এ রকম কোনো ত্রুটি দেখা দিলে তা বিনামূল্যে মেরামত করে দেওয়া হবে। সাধারণভাবে এটিও জায়েয।

শপিং কমপ্লেক্সে গমনকারী সকলের জন্য নাসীহাত

প্রথমত, মালিকদের উদ্দেশ্যে

ইসলাম মানুষকে ব্যবসা করতে উদ্বুদ্ধ করে; বরং এটি শ্রেষ্ঠতম উপার্জনের একটি। রাফি ইবনু খাদীজ ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, "হে আল্লাহর রাসূল, কোন ধরনের উপার্জন শ্রেষ্ঠ?" তিনি ﷺ জবাব দিলেন, "মানুষের নিজ হাতের উপার্জন এবং প্রতিটি হালাল বিক্রয়।"[৯৯]

এ ছাড়া মুহাজির সাহাবি আব্দুর রহমান ইবনু আওফ ﵁-কে তাঁর দ্বীনি ভাই আনসার সাহাবি সাদ ইবনুর রাবি ﵁ নিজের সম্পত্তির অর্ধেক দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আব্দুর রহমান জবাব দেন, "আল্লাহ্ আপনার পরিবার ও সম্পত্তিতে বারাকাহ দিন। আমাকে কেবল বাজার কোন দিকে, তা দেখিয়ে দিন।"[১০০]

কমপ্লেক্সের মালিকদের প্রতি আমাদের পরামর্শ থাকবে

১) মার্কেটের একদম প্রাণকেন্দ্রে এমন একটি মাসজিদ নির্মাণ করুন, যেখানে মার্কেটের সকল মানুষের জায়গা হবে। কারণ, সব মুসলিমের উপরই সালাত ফরয। এ মাসজিদের নির্দিষ্ট ইমামও থাকতে হবে। সালাতের পর সংক্ষিপ্ত তালিমেরও ব্যবস্থা থাকলে ভালো। অথবা এর বদলে লিফলেট জাতীয় কিছু বিলি করা যায়। কারণ, বাজার হলো দ্বীন থেকে উদাসীনতার স্থান। তাই এখানে এমন জিনিসের ব্যবস্থা থাকতে হবে, যা দ্বীনের কথা স্মরণ করায়।

২) সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ব্যবস্থা করুন। সিকিওরিটির দায়িত্বে থাকা লোকদের পর্যাপ্ত সার্ভেইল্যান্স ক্যামেরা ও অফিস কক্ষের ব্যবস্থা

---

[৯৯] *মুসনাদু আহমাদ*: ৪/১৪১; শাইখ আল-আলবানি একে *সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব* গ্রন্থে সহীহ বলেছেন

[১০০] *বুখারি*: ৩৯৩৭

করুন। খালি চোর ধরাটাই যেন নিরাপত্তাকর্মীদের দায়িত্ব না হয়। ইসলামী নিয়ম লঙ্ঘন হচ্ছে কি না কোথাও, তাও যেন নজরদারিতে থাকে।

৩) দোকান মালিকদের প্রতি লক্ষ রাখুন। খেয়াল রাখবেন তাঁদের বেচাকেনা ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে নাকি সাংঘর্ষিক।

৪) ইসলামী বইপত্র, অডিও-ভিডিও বিক্রেতাদের জন্য ভাড়া কমিয়ে হলেও তাদের আপনাদের শপিং কমপ্লেক্সে দোকান দিতে উদ্বুদ্ধ করুন। ফলে যারা মার্কেটের এই দোকান থেকে ওই দোকানে ঘুরছে তাদের জন্য হেদায়াতের উৎসগুলো হাতের কাছেই থাকবে।

৫) নারী-পুরুষের মেলামেশা রোধ করুন। নারী ও পুরুষের জন্য দূরত্ব বজায় রেখে আলাদা জায়গা নির্ধারণ করুন।

দ্বিতীয়ত, দোকান মালিক ও কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে

১) ব্যবসা-বাণিজ্যের মাসয়ালা-মাসায়িল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জেনে নিন। বেচাকেনায় আগ্রহী প্রত্যেকের জন্যই এই জ্ঞান আবশ্যক, যাতে হালালভাবে ব্যবসা করা যায় ও হারাম থেকে দূরে থাকা যায়। অথচ আজকাল অনেক মুসলিমই এসব না জেনে ব্যবসা করছে। উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ বলেছেন,

> "আমাদের বাজারে যেন সেসব বিক্রেতারাই আসে, যাদের দ্বীনের বুঝ রয়েছে।"[১০১]

আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াকুব ﵀ বলেন, আমার বাবা বলেছেন,

> "আমি উমার বিন আল খাত্তাবের শাসনামলে ব্যবসা করতাম। উমার বলেছেন, 'কোনো বিদেশি যেন আমাদের বাজারে বিক্রয় না করে, কারণ তারা এখনো দ্বীনের বুঝ অর্জন করেনি এবং মাপে ও ওজনে অসৎ।"[১০২]

আলী ইবনু তালিব ﵁-কে এক লোক বললেন, "হে আমীরুল মুমিনীন, আমি ব্যবসা করতে চাই।" তিনি জবাব দিলেন, "ব্যবসার আগে দ্বীনের বুঝ অর্জন করো। যারা দ্বীনের বুঝ অর্জনের আগে ব্যবসায় নামে, তারা ক্রমাগত সুদে লিপ্ত হয় এবং তা ছাড়তে পারে না।"[১০৩]

---

[১০১] *তিরমিযি* : ৪৮৭; আল-আলবানি *সহীহ তিরমিযি* : ৪৮৭ কিতাবে একে সহীহ বলেছেন।
[১০২] মুয়াত্তা মালিক : ৩/২২২
[১০৩] আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কীহ : ১/৬৫

আজ মুসলিমদের জন্য বড় ফিতনা হয়ে দাঁড়িয়েছে অজ্ঞ মুসলিম ও অমুসলিম বিক্রেতারা, যারা ইসলামী হালাল-হারামের বিধানের কিছুই জানে না। এমনকি যারা জানে, তাদের অনেকেও অধিক লাভের লোভে সেসব অমান্য করে।

২) ইসলামী অনুশাসন মেনে চলুন। আমাদের ব্যবসায়ীরা আজ পশ্চিমা কোম্পানিদের সাথে বাঁধা পড়ে গেছে, যারা তাদের পণ্য প্রচার ও বিক্রি করার সময় খেয়ালও করে না ইসলামী কোনো বিধান লঙ্ঘন হচ্ছে কি না। মুসলিম ব্যবসায়ীদের উচিত এসব ব্যাপারে কড়া নজরদারি রাখা।

৩) চুক্তি ও ওয়াদা পূর্ণ করুন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

"হে মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো।"[১০৪]

"তোমরা পরস্পর অঙ্গীকারবদ্ধ হলে আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, নিজেদের অঙ্গীকার পাকাপাকি করার পর তা ভঙ্গ কোরো না, যেহেতু তোমরা আল্লাহকে নিজেদের উপর সাক্ষী বানিয়ে নিয়েছ। তোমরা যা করো, সে সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ অবগত।"[১০৫]

কারণ, অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে মানুষের মাঝে অবিশ্বাস ও কলহ দানা বাঁধে, যার পরিণতি আল্লাহই ভালো জানেন। অঙ্গীকার পূর্ণ করার উপর জোর দিয়ে ইসলাম লেনদেনে সাক্ষী রাখার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ্ বলেন :

"আর তোমরা যখন পরস্পর কেনাবেচা করো, তখন সাক্ষী রেখো।"[১০৬]

সৎ ও স্পষ্টভাষী হতে হবে। পণ্যের দোষ গোপন করা যাবে না। বিক্রেতা পণ্যের দোষ সম্পর্কে অবগত থাকলে ক্রেতার কাছে তা ব্যক্ত করা বাধ্যতামূলক। হাদীসে একে বারাকাহ লাভের উপায় বলা হয়েছে। হাকীম বিন হিযাম ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত লেনদেনের উভয় পক্ষের অধিকার রয়েছে লেনদেন বাতিল করার। উভয়ই সৎ ও স্বচ্ছ থাকলে লেনদেনে বারাকাহ পাবে। আর যদি তারা (পণ্যের দোষ) গোপন করে ও মিথ্যা বলে, তাহলে তা থেকে বারাকাহ তুলে নেওয়া হবে।"[১০৭]

---

১০৪ সূরাহ আল-মায়িদাহ, ৫ : ১

[১০৫] সূরাহ আন-নাহল, ১৬ : ৯১

[১০৬] সূরাহ আল-বাকারাহ, ২ : ২৮২

[১০৭] *বুখারি* : ১৯৭৩; *মুসলিম* : ১৫৩২

নবীজি ﷺ সৎ ব্যবসায়ীর প্রশংসা করেছেন। আবু সাঈদ ؓ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীরা কিয়ামাতের দিন নবীগণ, সিদ্দীকগণ ও শহীদগণের সাথে থাকবে।"[১০৮]

তিনি ﷺ বিশ্বাসঘাতক মিথ্যাবাদী ব্যবসায়ীদের নিন্দা করে বলেছেন, "ব্যবসায়ীরা কিয়ামাতের দিন দাম্ভিক পাপী হিসেবে উত্থিত হবে; শুধু আল্লাহভীরু, নেককার ও সৎ ব্যবসায়ী বাদে।"[১০৯]

৪) ঠিকভাবে ওজন করুন, মাপে সঠিক দিন। এর অন্যথা করার বিরুদ্ধে সতর্ক করুন। রাসূল ﷺ-এর আগমনের আগে মদীনার ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটি ঘৃণ্য স্বভাব ছিল মাপে কম দেওয়া, আল্লাহ এই স্বভাবের নিন্দা করেছেন। এমন ব্যবসায়ীদের আল্লাহ অপমানজনক শাস্তির ওয়াদা করেছেন।

> **"দুর্ভোগ ঠগবাজদের জন্য, যারা লোকের কাছ থেকে মেপে নেওয়ার সময় পুরামাত্রায় নেয়; আর যখন তাদের মেপে দেয় বা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে তাদের (মৃত্যুর পর) পুনরুত্থিত করা হবে এক মহাদিবসে? সেদিন মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে।"[১১০]**

আলিমগণ বলেন, ওজনে কম দেওয়া কবিরা গুনাহ। যারা মাপে ঠিকঠাক দেয়, আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন।

> **"মাপ দেওয়ার সময় মাপ পূর্ণমাত্রায় করবে, আর ওজন করবে ত্রুটিহীন দাঁড়িপাল্লায়। এটাই উত্তম নীতি আর পরিণামেও তা উৎকৃষ্ট।"[১১১]**

ইমাম মালিক ؒ-কে এক ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো, যে পাল্লায় অন্য কিছু রেখে ওজন বাড়িয়ে রাখত। তিনি বলেন, "আমার মতে তাকে বাজার থেকে বের করে দেওয়া উচিত।"[১১২] আমাদের সময়ে আমরা এ কাজ করতে পারি সেই বিক্রেতার লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া এবং তা আর নবায়ন না করার মাধ্যমে।

---

[১০৮] *তিরমিযি* : ১২০৯, আল-আলবানি *সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব* : ২/১৬২ গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন।

[১০৯] *তিরমিযি* : ১২১০, তিনি একে হাসান সহীহ বলেছেন; আল-আলবানি *সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব* : ২/১৬২ গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন।

[১১০] সূরাহ আল-মুতাফফিফীন, ৮৩ : ১-৬

[১১১] সূরাহ বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৩৫

[১১২] মাওয়াহিবুল জালীল : ৬/১৯৩

৫) হারাম জিনিসের বিক্রি প্রতিরোধ করুন। বাদ্যযন্ত্র, মদ, প্রাণীর ছবি, অশ্লীল ক্যাসেট-সিডি, পর্নোগ্রাফি, লটারির টিকিট ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। নানা রকম হারাম লেনদেনের ব্যাপারেও সতর্ক হতে হবে। যেমন :

ঝুঁকি লেনদেন : এর অর্থ হলো অস্তিত্বহীন বা অজানা জিনিসের বেচাকেনা, এমন জিনিস যা ক্রেতাকে দেওয়া যায় না, এমন জিনিস বিক্রি করা যা ক্রেতা এখনো হাতে পায়নি। এগুলো সব বাতিল লেনদেন।

মালিক হওয়ার আগে বিক্রি করা : কোনো জিনিসের মালিক হওয়ার আগে তা বিক্রি করা হারাম। ব্যবসায়ী কোনো পণ্য নিজের মালিকানায় আনার আগে অন্যের কাছে বিক্রি করাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষিদ্ধ করেছেন।

প্রতারণা : পণ্যের দোষ গোপন করা বা ক্রেতাকে ঠকাতে পণ্য মিথ্যামিথ্যি সৌন্দর্যমণ্ডিত করা।

আরেকজনের উপর দিয়ে গিয়ে বিক্রি করা : এর অর্থ হলো বিক্রেতা ও ক্রেতা কোনো পণ্য বা সেবা লেনদেনের ব্যাপারে চুক্তি চূড়ান্ত করে ফেলেছে, এমন সময় তৃতীয় পক্ষ এসে আরও কম দামে সেই পণ্য বা সেবা অফার করা।

৬) বিতর্কিত জিনিস বিক্রি করা থেকে সাবধান থাকুন। যেমন : চুরি বা জবরদখলকৃত মালামাল। আল্লাহ তা’আলা বলেন :

> **“হে ঈমানদারগণ, তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ গ্রাস কোরো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা বৈধ। এবং নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনো না কিংবা তোমরা পরস্পরকে হত্যা কোরো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি কৃপাময়।”**[১১৩]

ইসলাম কল্যাণকর, আর ইসলাম শুধু ভালো জিনিসের বেচাকেনাকেই কেবল বৈধ মনে করে।

৭) ক্রয়-বিক্রয়ে দয়াশীল হোন। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন যে বিক্রয়, ক্রয় বা ঋণের টাকা দাবি করার সময় দয়ালু হয়।”[১১৪] আল-হাসান আল-বাসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “বাজারবাসীদের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। আমাকে জানানো হয়েছে যে, একটা

---

[১১৩] সূরাহ আন-নিসা, ৪ : ২৯

[১১৪] *বুখারি* : ১৯৭০

পয়সা কম থাকলে নিজের ভাইয়ের কাছেও এরা বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানায়।”[১১৫]

৮) নারীদের সাথে কথা বলার সময় শিথিলতা দেখাবেন না। অযথা কোমলতা ও চাটুকারিতা প্রদর্শন থেকে বিরত থাকুন। এ রকম আচরণ শয়তানের ধোঁকার অংশ।

৯) দানশীলতা দেখান। কাইস ইবনু আবু গারযাহ ﵁ বলেন, আমরা বাজারে থাকা অবস্থায় নবীজি ﷺ আমাদের কাছে এলেন এবং বললেন, “ভুল ও মিথ্যার সাথে বাজার মিশ্রিত। অতএব একে দান-সদকার সাথে মিশ্রিত করো।”[১১৬]

তৃতীয়ত, নিরাপত্তা কর্মীদের উদ্দেশ্যে

নিরাপত্তা কর্মীদের কাঁধে দায়িত্বের বিশাল ভার রয়েছে। তাঁদের প্রতি আমাদের পরামর্শ :

১) দায়িত্বে সচেতন থাকতে হবে। তাঁদের উপর যে আস্থা মালিকপক্ষের রয়েছে, বেতন নিয়ে অসন্তোষের জের ধরে সেটা ভঙ্গ করা উচিত নয়।

২) মুসলিমদের সম্মান রক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষ, পুলিশ বাহিনী প্রভৃতির সাথে সহযোগিতামূলক কাজ করতে হবে।

৩) সন্দেহজনক কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে ও হারাম দৃষ্টিপাত পরিত্যাগ করতে হবে।

চতুর্থত, সৎ কাজের আদেশদাতা ও অসৎ কাজের নিষেধকারীদের উদ্দেশ্যে

এঁরা হলেন সেই সকল মানুষ, যারা দ্বীনি পরিবেশ সংরক্ষণে কাজ করেন। তাঁদের প্রতি ভালোবাসার কারণে তাঁদের প্রতি আমাদের কিছু পরামর্শ

১) আপনাকে ধৈর্যশীল হতে হবে ও আল্লাহর কাছে পুরস্কার আশা করতে হবে। কারণ, আপনি যা করছেন, তা আসমান-জমিনের প্রতিপালকের কাছে প্রিয়। আপনি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ফরয দায়িত্বকে পুনর্জীবিত করেছেন এবং তা করতে গিয়ে কোনো অসদুপায় অবলম্বন করেননি, এর ফলে অনেক ফিতনা গজিয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে। আল্লাহ তা’আলা বলেন :

---

[১১৫] বায়হাকি, *শুয়াবুল ঈমান* : ৭/৪৪২

[১১৬] *নাসাঈ* : ৩৮০৮; আল-আলবানি একে *সহীহুন নাসাঈ* : ৮/৩৭১ কিতাবে সহীহ বলেছেন।

“তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভূত করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও ও অসৎ কাজের নিষেধ করো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করে চলো।”[১১৭]

“তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হোক, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে, সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করে, আর এরাই সফলকাম।”[১১৮]

২) যে দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয়েছে, তা পালন করার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আপনার আমলনামা পরিচ্ছন্ন রাখুন। প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার সাথে কাজ করুন।

৩) নিজের কাজে ভুলত্রুটি হয়ে গেলে তার জন্য ক্ষমা চাইতে লজ্জিত হবেন না। আপনি যা পরিবর্তন করতে সক্ষম ও যতটুকু পৌঁছাতে সক্ষম, ততটুকু কাজ করুন।

৪) মার্কেটে আসা নারী-পুরুষদের মাঝে ইসলামী বই, লিফলেট ও ওয়াজের রেকর্ডিং বিলি করুন।

৫) এ সকল জায়গায় দোকান খুলে ইসলামী বই ও রেকর্ডিং বিক্রি করুন।

৬) নারীদের জন্য দাওয়াহ্ কর্মকাণ্ডের সুযোগ সৃষ্টি করুন।

৭) হাসি মুখ, দয়া ও সৌজন্যসহকারে নরম স্বরে কথা বলুন। এটি মানুষের হৃদয়ে কথা পৌঁছানোর মাধ্যম।

৮) মানুষকে আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে ভয় দেখান এবং তাঁর পুরস্কারের ব্যাপারে উৎসাহ জোগান।

৯) যারা আপনার কথার বিরোধিতা করে, তাদের সামনে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করুন। বুদ্ধিবৃত্তিক ও যৌক্তিক বিতর্কে লিপ্ত হোন।

১০) দাওয়াহর জন্য উপহার বিনিময় করুন।

১১) কী কী বিষয়ে কথা বলা আবশ্যক, তার তালিকা প্রস্তুত রাখুন।

১২) স্বর্ণ ও নারীদের পোশাক বিক্রেতাদের অন্তরে দাওয়াতি চেতনা জাগ্রত করুন, যাতে তারা পণ্য বিক্রয়ের পাশাপাশি এ কাজেও তৎপর হয়।

---

[১১৭] সূরাহ আলে ইমরান, ৩ : ১১০

[১১৮] সূরাহ আলে ইমরান, ৩ : ১০৪

১৩) মার্কেটে গমনাগমনকারী যুবসমাজের প্রতি দয়ালু হোন। আত্মবিশ্বাস অর্জন করে তাদের কল্যাণের পথে ডাকুন। ইসলামী বই ও রেকর্ডিং উপহার দিয়ে তাদের কাছে টানুন। দূরে ঠেলে দেবেন না।

১৪) মন্দ কাজের বিরুদ্ধে কাজ করার সময় প্রজ্ঞা ও তীক্ষ্ণতার সাথে কাজ করুন। কর্তৃপক্ষ কোনো মন্দ কাজ প্রতিরোধে উদাসীনতা দেখালে দ্রুত তা তাদের নজরে আনুন।

১৫) মার্কেটকে দাওয়াহর ক্ষেত্রে পরিণত করুন। শপিং কমপ্লেক্স মালিকরা দাওয়াহর কাজে আগ্রহী যুবকদের সাহায্য-সহযোগিতা দিলেই কেবল তা সম্ভব। এর ফলে যেমন ভালো ও সত্যিকারের ক্রেতার আগমন বাড়বে, তেমনি আখিরাতেও প্রতিদান পাওয়া যাবে।

একটি সফল দাওয়াহ মডেল : একবার ইসলামের একদল মহিলা শিক্ষার্থী বেপর্দা চলাফেরাকারী নারীদের জন্য কিছু করতে চাইলেন। তাঁরা নজরকাড়া ডিজাইনের দাওয়াহ কার্ড তৈরি করলেন, যার খামে লেখা ছিল "কারণ, আমরা আপনাদের ভালোবাসি"। এতে মানুষের উপর দারুণ প্রভাব পড়ে এবং অনেক নারীই পর্দা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ হন।

পঞ্চমত, এসব মার্কেটে গমনকারী পুরুষদের উদ্দেশ্যে

১) একজন আদর্শ মুসলিম শুধু প্রয়োজনের বাজার-মার্কেটে যাবে, এমনি এমনি ঘোরাফেরার জন্য না।

২) শপিং কমপ্লেক্সের উপর পথঘাটের বিধান প্রযোজ্য। আবু সাইদ আল-খুদরি ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "পথের উপর বসা থেকে সাবধান।" সাহাবাগণ বললেন, "আমাদের তো আর উপায় নেই। দরকারি কথাবার্তা বলার জন্য আমাদের সেখানে বসতেই হয়।" রাসূল ﷺ বললেন, "যদি বসতেই হয়, তাহলে পথের হক আদায় করো।" জিজ্ঞেস করা হলো, "পথের হক কী কী?" তিনি ﷺ বললেন, "দৃষ্টি অবনত করা, অন্যের ক্ষতি না করা, সালামের জবাব দেওয়া, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা।"[১১৯] শপিং কমপ্লেক্সে বসে থাকা ব্যক্তিদেরও এ সকল আদব মানতে হবে।

৩) ক্রমাগত আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে। কারণ, বাজার এমন জায়গা, যা আল্লাহর প্রতি উদাসীন করে তোলে। ইবনু আব্বাস ﵁ বলেছেন, "কেউ হয়তো

---

[১১৯] *বুখারি* : ২৩৩৩; *মুসলিম* : ২১২১

নিশ্চিন্ত মনে বাজারে হেঁটে বেড়াচ্ছে, অথচ তার নাম সেসব ব্যক্তিদের মাঝে নির্ধারিত হয়ে গেছে যারা শীঘ্রই মারা যাবে।"[১২০]

৪) বাজারে প্রবেশের দু'আ পড়া। ক্রেতা, বিক্রেতা, দর্শনার্থী সকলকেই এই দু'আ পড়তে হবে, যা রাসূল ﷺ বাজারে ঢোকার সময় পড়তেন।

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহ, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ইয়ুহ্ য়ি ওয়া ইয়ুমীতু, ওয়া হুয়া হাইয়্যুন লা-ইয়ামূতু, বিয়াদিহিল খাইর, ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর।" একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই, রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসামাত্রই তাঁর। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন। আর তিনি চিরঞ্জীব, মারা যাবেন না। সকল প্রকার কল্যাণ তাঁর হাতে নিহিত। তিনি সকল সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান।[১২১] এ ছাড়া সাধারণভাবে সকল জায়গায় যেকোনো সময় সেসব আয়াতও বলা যায়, যা আল্লাহর স্মরণের দিকে ডাকে। শুধু যেসব জায়গায় আল্লাহর নাম উচ্চারণ হারাম, সেসব জায়গা বাদে। যেমন : টয়লেট।

৫) ঝগড়া ও কঠোরতা পরিত্যাগ করা। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর বিন আস ﷺ রাসূল ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন, "তিনি কর্কশ বা কঠোর হৃদয়ের নন এবং বাজারে শোরগোলকারী নন।"[১২২] আত-তীবি ﷺ বলেন, "অর্থাৎ, তিনি সম্মানিত আত্মার অধিকারী ভদ্র ছিলেন। তিনি খারাপ আচরণ করে মানুষদের সাথে গলা উঁচিয়ে কথা বলতেন না। আর বাজারে অবিরত চেঁচামেচি করতেন না। তিনি তাদের প্রতি নম্র ও দয়ালু ছিলেন।"[১২৩] অথচ আমাদের সময়ে মার্কেট ভর্তি হাজারো শোরগোল, চিৎকার, চেঁচামেচি আর ঝগড়া। এমনকি একটা কথার জের ধরে এক মুসলিম অপর মুসলিম ভাইয়ের রক্ত পর্যন্ত ঝরায়।

৬) সালাম দেওয়া। কারণ, সালামের মাধ্যমে ভালোবাসা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়। আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা মুমিন না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর পরস্পরকে ভালো না বাসা পর্যন্ত

---

[১২০] *আল-হাকিম* : ২/৪৮৭; তিনি বলেছেন, "এর বর্ণনাসূত্র সহীহ, কিন্তু আল-বুখারি ও মুসলিম তা উল্লেখ করেননি।" আয-যাহাবি ﷺ ও এ ব্যাপারে একমত

[১২১] *তিরমিযি* : ৩৪২৮; আল-আলবানি ﷺ *সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব* : ২/১৪২ গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন; অন্যান্য অনেকে একে জয়িফ বলেছেন, যেমন ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ, মুল্লা আলী কারি ﷺ, আল-আজলুনি ﷺ

[১২২] *বুখারি* : ২০১৮

[১২৩] মিরকাতুল মাফাতীহ : ১৬/৪১৮

তোমরা মুমিন হতে পারবে না। এমন একটি বিষয়ের কথা জানিয়ে দিই যেটা করলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা তৈরি হবে? পরস্পরকে বেশি বেশি সালাম দেবে।"[১২৪]

৭) মুসলিমদের ক্ষতি না করা। আবু মূসা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ যদি আমাদের মাসজিদ বা বাজারের ধার দিয়ে হেঁটে যায় আর তার সাথে তির থাকে, তাহলে সে যেন তিরের লৌহফলক ধরে রাখে যাতে তা কোনো মুসলিমের ক্ষতি না করে।"[১২৫] এই উপমা বর্তমানের যেকোনো অস্ত্রের ক্ষেত্রেই খাটে।

৮) দৃষ্টি অবনত রাখা। আল্লাহ চোখকে বানিয়েছেন অন্তরের আয়না। চোখের দৃষ্টি অবনত রাখলে হৃদয়ও তার কামনা-লালসা দমিয়ে রাখে। আর চোখকে বাঁধনহারা করে দিলে অন্তরেও নানা রকম কামনা-বাসনা জাগ্রত হয়। আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আল্লাহ প্রতিটি আদামসন্তানের জন্য তার নির্ধারিত যিনার পরিমাণ লিখে রেখেছেন এবং সে তা নিঃসন্দেহে করবে। চোখের যিনা হলো দৃষ্টিপাত, জিহ্বার যিনা হলো কথা, হৃদয়ের যিনা হলো কামনা, আর গুপ্তস্থান হয় সেটিকে বাস্তবায়ন করে বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।"[১২৬] তিনি ﷺ চোখের কথা বলে শুরু করেছেন। বোঝা গেল যে এটিই হাত, পা, অন্তর ও লজ্জাস্থানের যিনার শেকড়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

> **"মুমিন পুরুষদের বলো তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে। এটাই তাদের জন্য বেশি পবিত্র। তারা যা কিছু করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ খুব ভালোভাবেই জানেন। আর মুমিনা নারীদের বলে দাও তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে।"**[১২৭]

জানা কথা যে, বাজার-মার্কেট হলো মানুষ শয়তান ও জিন শয়তানদের প্রিয় জায়গা। তাই আল্লাহ যা দেখা হারাম করেছেন, তা দেখা থেকে বিরত থাকার জন্য বাজার-মার্কেটে সদা সচেতন থাকতে হবে। ইসলামী শরিয়তে বর্ণিত যিকির-আযকারগুলো করতে হবে। আমাদের সময়ে নারীরা ঘর থেকে খুব বেশি বের

---

[১২৪] *মুসলিম* : ৫৪

[১২৫] *বুখারি* : ৬৬৬৪; *মুসলিম* : ২৬১৫

[১২৬] *বুখারি* : ৫৮৮৯; *মুসলিম* : ২৬৫৭

[১২৭] সূরাহ আন-নূর, ২৪ : ৩০-৩১

হওয়া শুরু করেছে এবং মার্কেটে যাচ্ছে। এ ছাড়া প্রবেশ ফটকে, দেয়ালে নারীদের ছবিসংবলিত বিজ্ঞাপন সাঁটা থাকে। তাই দৃষ্টি অবনমিত করে ক্ষতি এড়ানো আবশ্যক। জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ ﵁ বলেন, "আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে অনিচ্ছাকৃত দৃষ্টিপাতের ব্যাপারে প্রশ্ন করলাম। তিনি আমাকে আদেশ করেছেন এমনটা ঘটলে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে।"[১২৮]

বুরায়দা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী ﵁-কে বললেন,

> "হে আলী, অনিচ্ছাকৃত দৃষ্টির পর ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিপাত করবে না। কারণ, আল্লাহ প্রথম দৃষ্টি ক্ষমা করবেন, দ্বিতীয়টি নয়।"[১২৯]

৯) মুসলিমদের সম্মান রক্ষা করা। সম্মান-চোরদের মতো হওয়া থেকে সাবধান। এরা নেকড়ের মতো মুসলিমদের ভিড়ে ঢুকে গিয়ে নানা রকম উসকানি, উৎপীড়ন ও ইভটিজিং করে। মনে রাখবেন, সম্মানহানির অপরাধের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে নির্দিষ্ট করে শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। এটা আমলনামায় একটা ঋণের মতো, যা পরিশোধ করতেই হবে। তবে যারা বিশুদ্ধভাবে তাওবাহ করেছে ও আর-রহমানের রহমতের ছায়ায় এসেছে, তাদের কথা আলাদা। যাদের অন্তরে এ রকম রোগের অস্তিত্ব আছে, তাদের আমরা সেটাই বলব যে কথা রাসূল ﷺ বলেছিলেন যিনা করার অনুমতি চাইতে আসা এক যুবককে। তিনি ﷺ বলেছিলেন, "কেউ তোমার মায়ের সাথে এমন করলে কি তোমার ভালো লাগবে?" সে উত্তর দিলো, "না।" রাসূল ﷺ একে একে বললেন, "কেউ তোমার কন্যা, বোন, খালা, ফুফুর সাথে এমন করলে কি তোমার ভালো লাগবে?"[১৩০]

১০) আল্লাহর দিকে দাওয়াহ দেওয়া। এক বোবা ব্যক্তি আল্লাহর দিকে দাওয়াতের কাজ করতেন। তিনি নিজেকে খাটো করেননি বা ওজর আছে বলে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকেননি। তিনি টাইপ রাইটার হিসেবে কাজ করে অল্প যে বেতন পেতেন, তা দিয়ে ইসলামী বই ও রেকর্ডিং কিনতেন। তারপর মার্কেটে গিয়ে কোনো হারাম সংঘটিত হতে দেখলে কাছে গিয়ে ওই কাজ করা ব্যক্তিকে হাসিমুখে ওই বিষয়ের উপযোগী একটি রেকর্ডিং ধরিয়ে দিতেন। তারপর গলায় ঝোলানো কাগজটির

---

[১২৮] *মুসলিম* : ২১৫৯

[১২৯] *আবু দাউদ* : ২১৪৯; *তিরমিযি* : ২৭৭৭; *মুস্তাদরাক আল-হাকিম*, তিনি ﵀ বলেন, "এটি মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ বর্ণনা, কিন্তু তিনি বা বুখারি কেউই এটি উল্লেখ করেননি।" আয-যাহাবি ﵀ একমত পোষণ করেছেন : ২/২১২। এ ছাড়া *সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব* : ২/১৮৯ গ্রন্থে আল-আলবানি ﵀ একে গ্রহণযোগ্য বলেছেন।

[১৩০] *আহমাদ* : ৫/২৫৬; *আস-সিলসিলা আস-সহীহা* : ১/৬৪৫ গ্রন্থে আল-আলবানি একে সহীহ বলেছেন।

দিকে দেখাতেন, যেখানে লেখা “দুঃখিত। আমি বোবা।” তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো এসব কাজ করে তিনি কোনো ফল পেয়েছেন কি না। তিনি জবাবে লিখলেন, “একদিন আমি একটি দোকানে অনেক খারাপ কাজ সংঘটিত হতে দেখি। আমি বিক্রেতাকে একটি রেকর্ডিং এর মাধ্যমে নাসীহাত করলাম, যা কিনতে আমার মাত্র ২ রিয়াল খরচ হয়েছিল। এর অনেকদিন পর আমি সেই দোকানে আবার গেলাম। আমার মনেও নেই যে, আমি এখানে আগে এসেছিলাম। দোকানদার আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেতে লাগলেন। আমি ইশারায় জানালাম তিনি হয়তো আমাকে অন্য কেউ মনে করেছেন। তিনি বললেন, ‘আপনিই কি সেই লোক নন, যিনি আমাদের এই রেকর্ডিংটা দিয়েছেন? আমরা আগে ইসলামের নামটা ছাড়া কিছুই জানতাম না। আপনার দেওয়া এই রেকর্ডিং শোনার পর আল্লাহ আমাদের হিদায়াত দিয়েছেন। আমরা যা করছিলাম, তা পরিত্যাগ করলাম এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সংশোধন করে নিলাম। আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।” আপনারাও ব্লুটুথ, শেয়ারইটের মতো মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে দাওয়াহ ছড়িয়ে দিতে পারেন।

১১) অপচয় করবেন না। অদরকারি জিনিসপত্র কিনে ঘর ভর্তি করবেন না। অপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনা থেকে নিজের লোভ সংবরণ করতে হবে। বেশি দামি হলেই বেশি ভালো হবে, এমন কথা নেই। দেখা যায় দাম বেশি কিন্তু প্রায় মেয়াদোত্তীর্ণ, তারপরও মানুষ সেই জিনিস কিনছে।

১২) শপিং যেন সময় অপচয়ের মাধ্যমে পরিণত না হয়, কারণ এর ব্যাপারে পরকালে জিজ্ঞেস করা হবে। ইবনু মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “কয়েকটি বিষয়ের জবাব দেওয়ার আগে বান্দা একচুলও পা নাড়াতে পারবে না। তার জীবন, কোন পথে তা ব্যয় করেছে; তার জ্ঞান, কীভাবে তা ব্যবহার করেছে; তার সম্পদ, কীভাবে তা আয় ও ব্যয় করেছে; তার দেহ, কীভাবে তা ব্যবহার করেছে।”[১৩১]

১৩) বিভিন্ন পণ্যের চাকচিক্য দেখে মুসলিম বিমোহিত হবে না। মুসলিম কখনো দুনিয়া নিয়ে চিন্তিত হয় না বা এখান থেকে কিছু হারালে মুষড়ে পড়ে না। সে সব সময় আখিরাতের পাথেয় অর্জনে ব্যস্ত থাকে। দুনিয়া থেকে সে ততটুকুই নেয়, যতটুকু নিলে আখিরাতের উদ্দেশ্য পূরণে কাজে লাগে। আল্লাহ তা’আলা বলেন :

“তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে ও সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি হচ্ছে আসমানসমূহ ও জমিনের সমান, যা

[১৩১] *তিরমিযি* : ২৪১৭; তিনি একে হাসান সহীহ বলেছেন।

মুত্তাকীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।”[১৩২]

“এরাই কল্যাণকর কাজে দ্রুতগতি, আর তাতে তারা অগ্রগামী।”[১৩৩]

“তোমরা সৎকর্মে অগ্রগামী হও।”[১৩৪]

আল-হাসান ﵀ বলেন,

> “যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমার সাথে প্রতিযোগিতা করে, তাদের সাথে প্রতিযোগিতা করো। আর যার দুনিয়ার ব্যাপারে তোমার সাথে প্রতিযোগিতা করে, তা তাদের মুখের উপর ছুড়ে মারো।”[১৩৫]

ষষ্ঠত, এসব মার্কেটে গমনকারী নারীদের উদ্দেশ্যে

১) অবশ্যই লজ্জাশীলতা ও শালীনতার গুণের অধিকারিণী হতে হবে। সর্বক্ষণ ও সর্বত্র আল্লাহভীতি থাকতে হবে। এই হাদীসটি খুব গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে। আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> “দুই প্রকারের জাহান্নামি আমি এখনো দেখিনি। একদল সেই সব লোক যাদের হাতে গরুর লেজসদৃশ চাবুক থাকবে আর তা দিয়ে তারা লোকদের আঘাত করবে। আরেকদল সেই সকল নারী, যারা পোশাক পরেও উলঙ্গ থাকে। তারা মন্দের দিকে আহ্বান করে এবং এর প্রতি আসক্ত। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি এর সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ এত এত দূর থেকে পাওয়া যায়।”[১৩৬]

২) নারীদের বেশি বেশি ঘরের বাইরে বের হওয়া উচিত না। তাদের উচিত ঘরে থাকা, সন্তান প্রতিপালনে সময় দেওয়া, সালাত ঠিক রাখা, স্বামীর আনুগত্য করা, রামাদ্বানের সওম পালন করা, ভালো ছাড়া মন্দ কথা না বলা। এর মাধ্যমেই তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু যদি সত্যিকারই কোনো প্রয়োজন দেখা দেয় এবং তা করে দেওয়ার মতো অন্য কেউ না থাকে, তাহলে ইসলামী আদব রক্ষা করে বাইরে যেতে পারবে।

---

[১৩২] সূরাহ আলে ইমরান, ৩ : ১৩৩

[১৩৩] সূরাহ আল-মুমিনূন, ২৩ : ৬১

[১৩৪] সূরাহ আল মায়িদাহ, ৫ : ৪৮

[১৩৫] ইহইয়া উলুমুদ্দীন : ৩/২০৭

[১৩৬] *মুসলিম* : ২১২৮

যেমন :

ক) শরিয়ত নির্ধারিত পূর্ণ পর্দা করতে হবে।

খ) সাজসজ্জা ও সুগন্ধি ছাড়া বের হতে হবে। আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আল্লাহর বান্দীদের আল্লাহর মাসজিদে আসতে বাধা দিয়ো না। তারা ঘর থেকে সাজসজ্জা ও সুগন্ধি ছাড়া বের হবে।"[১৩৭]

গ) মাহরাম পুরুষ বা স্বামীসহ বের হতে হবে।

ঘ) পারতপক্ষে পুরুষ দোকানদারের সাথে কথা বলবে সাথে থাকা পুরুষ। নারীর কথা বলা লাগলে নরম কণ্ঠ পরিহার করে সিরিয়াস ভঙ্গিতে শুধু প্রয়োজনীয় কথাটুকু বলবে। আল্লাহ বলেন :

> **"হে নবীপত্নীগণ, তোমরা অন্য নারীদের মতো নও। তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে (পরপুরুষদের সঙ্গে) এমন আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বোলো না, যাতে ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরের লোকেরা প্রলুব্ধ হয়। তোমরা সংগত কথা বলবে।"[১৩৮]**

ঙ) একেবারেই অন্যায্য দাম দাবি না করা হলে দামাদামি করবে না। দাম নিয়ে তর্ক করতে হলে সম্মানজনক ও শালীন ভঙ্গিতে করবে। তবে এ কাজ সঙ্গে থাকা পুরুষটি করলে ভালো হয়।

চ) কেনার নিয়ত ছাড়া খালি দেখা ও সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে একটার পর একটা জিনিস নামাতে বলা যাবে না। এতে কখনো বিক্রেতা রেগে গিয়ে অসম্মানজনক আচরণ করে বসে।

ছ) পণ্য বা টাকা আদান-প্রদান করতে গিয়ে দোকানদারের সাথে হাত যাতে লেগে না যায়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। চুড়ি বা আংটির মাপ দেওয়ানোর সময়ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

জ) দোকানদারের সাথে যথাযথ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। দোকানদারকে আপত্তিকরভাবে কাছে আসার সুযোগ দেওয়া যাবে না।

---

[১৩৭] *আবু দাউদ* : ৫৬৫; *আদ-দারিমি* : ১২৪৮; আল-আলবানি *ইরওয়াউল গালীল* : ২/২৯৩ গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন; *বুখারি* : ৮৫৮ ও *মুসলিম* : ৪৪২, উভয় গ্রন্থে হাদীসটি এসেছে "তারা ঘর থেকে সাজসজ্জা ও সুগন্ধি ছাড়া বের হবে।" অংশটি বাদে

[১৩৮] সূরাহ আল-আহযাব, ৩৩ : ৩২

ঝ) নির্জন দোকানে প্রবেশ করা ঠিক না। আশপাশে মানুষজন আছে, এমন জায়গায় শপিং করা উচিত।

ঞ) ভিড়ভাট্টা বেশি আছে এমন স্থানে খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হবে, যাতে কোনো পুরুষের সাথে ধাক্কা লেগে না যায়।

ট) দোকানদারের পক্ষ থেকে অযাচিত ও সন্দেহজনক আচরণ টের পেলে সিনক্রিয়েট না করা, সম্মান বজায় রেখে সরে আসতে হবে। এ রকম দোকানদারদের থেকে আর কখনো কিছু কিনতে আসা যাবে না।

ঠ) হিজাব যেন সব সময় ঠিক থাকে, ভিড়ের মধ্যে অসাবধানে সরে না যায়, এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

ড) দোকানে বা টেইলার্সে কাপড়ের মাপ দেওয়ার জন্য কাপড় খোলা যাবে না। এটি হারাম। প্রয়োজনে ঘরে নিয়ে মাপ দেওয়ার ব্যাপারে সমঝোতায় আসতে হবে।

ঢ) বয়স কম হওয়ার দোহাই দিয়ে প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের পোশাকে শিথিলতা করা যাবে না।

ণ) অভিভাবকের অনুমতি না নিয়ে ঘর থেকে বের হওয়া যাবে না।

ত) ঘর থেকে বের হওয়ার দু'আ পড়তে ভোলা যাবে না।

থ) চলাফেরার সময় আল্লাহভীতি অন্তরে থাকতে হবে। ফিতনা সৃষ্টি বা দৃষ্টি আকর্ষণের মতো কিছু করা যাবে না।

দ) পারফিউমের দোকানে খেয়াল রাখতে হবে যে, গায়ে যেন সুগন্ধি লেগে না যায়।

সপ্তমত, অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে

সবচেয়ে বড় দায়িত্বের ভারটা অভিভাবকদের ঘাড়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মানুষের জন্য গুনাহ হিসেবে এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে উদাসীন হবে।"[১৩৯] আল্লাহ তা'আলা বলেন :

> **"হে বিশ্বাসীগণ, নিজেদের ও নিজেদের পরিবারবর্গকে সেই আগুন থেকে বাঁচাও, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।"**[১৪০]

---

[১৩৯] আবু দাঊদ : ১৬৯২; আল-আলবানি একে *সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব* : ২/২০৩ গ্রন্থে হাসান বলেছেন।

[১৪০] সূরাহ আত-তাহরীম, ৬৬ : ৬

তাই অভিভাবকদের খুব সতর্ক থাকা উচিত যেন নারীরা সত্যিকারের প্রয়োজন ছাড়া মার্কেটে গিয়ে ঘোরাফেরা না করে। মানুষরূপী নেকড়ে শয়তানের কুকুরগুলো তাদের দাঁত-নখ বের করে এসব জায়গায় ওত পেতে থাকে যে, কখন অভিভাবকহীন শিকারকে কাছে পাবে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "বাজারের গোলমাল থেকে সাবধান।"[১৪১]

লজ্জাজনক ব্যাপার হলো, অনেক নারীই বেপর্দা হয়ে দোকানদার বা অন্যান্য পরপুরুষের সাথে হেসে হেসে বা নরম স্বরে কথা বলে, অপ্রয়োজনীয় মেলামেশায় লিপ্ত হয়; অথচ সাথে থাকা পুরুষ অভিভাবক এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকে। তাদের গায়রাত কি এতই নিচে নেমে গেছে, তাদের পৌরুষ কি এতই দুর্বল হয়ে গেছে যে, এ রকম মেরুদণ্ডহীন আচরণ সে করতে পারছে? আলী ﷺ বলেছেন, "এতে কি তোমাদের আঁতে ঘা লাগে না যে, তোমাদের নারীরা কাফিরের ভিড়েভর্তি বাজারে যাবে?"[১৪২]

অষ্টমত, সাধারণভাবে সকল ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে

১) পিক আওয়ারে শপিং করা পরিহার করতে হবে। যেমন : বন্ধের দিন বা রমাদ্বানের রাত। কতক্ষণের মধ্যে কেনাকাটা শেষ করতে হবে, তার রুটিন ঠিক করে নিতে হবে।

২) রাগান্বিত বা বিরক্ত অবস্থায় শপিং করবেন না। না হলে আপনি অপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে থাকবেন।

৩) পরিবারের ঠিক কী কী দরকার, তা জেনে নিয়ে বাজারে যান। অযথা দামি জিনিস না কিনে একই গুণসম্পন্ন সাশ্রয়ী জিনিস থাকলে সেটি কিনুন।

৪) ফল ও সবজির মৌসুম শুরু বা শেষের দিকে সেগুলো না কিনে মাঝামাঝি সময়ে কিনুন, যখন দাম কমে আসে।

৫) "যেটা দরকার, সেটা কিনব। যেটা চাই, সেটা না।" এই মূলনীতি অনুসরণ করুন।

৬) কী কী কিনতে হবে, তার তালিকা আগেই লিখে নিয়ে যান। এতে দুটি লাভ হয়:

ক) ভুলে যাওয়ার সমস্যা নেই।

---

[১৪১] *মুসলিম* : ৪৩২

[১৪২] *আহমাদ*: ১/৩৩; আল-আরনাউত ﷺ এর সনদ যঈফ বলেছেন।

খ) সময় বাঁচে।

৭) নারীরা বান্ধবীদের সাথে দলবেঁধে শপিং এ না যাওয়া উচিত। তখন একে অপরের দেখাদেখি দামি বা অপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনা এবং পরস্পর প্রতিযোগিতা করার মনোভাব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

৮) একবারেই বের হয়ে সব দরকারি জিনিস কিনে ফেলুন। এতে সময়, শ্রম ও টাকা বাঁচে।

৯) এমন দোকান খুঁজে নিন যেখানে আপনার দরকারি সব জিনিস বা বেশির ভাগ জিনিস একত্রে পাওয়া যায়।

শুধু নারীদের জন্য মার্কেট এবং এর গুরুত্ব

আগেকার যুগে নারীরা শালীনতা বজায় রাখতে বেশি তৎপর ছিল, পুরুষদের সাথে কম মিশত, ঘর থেকে কম বের হতো। এখন যেহেতু দুনিয়ার জন্য প্রতিযোগিতা বেড়ে গেছে, তাই নারীদেরও বেশি বেশি ঘর থেকে বের হওয়া লাগে। প্রতিদিনই নতুন নতুন মডেলের পণ্য ও পোশাক বাজারে আসছে। শুধু নারীদের জন্য আলাদা মার্কেটের ব্যবস্থা থাকলে তা অবশ্যই সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন যেকোনো মানুষের মনে ধরবে। মিক্সড মার্কেটে যেসব ব্যাপক আকারের সমস্যা হয়। পুলিশি নজরদারি বৃদ্ধি করেও সেগুলো নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি। এক নারী জানান, “সবচেয়ে বিব্রতকর অবস্থা হলো, আমার দরকারি বিভিন্ন জিনিসের দাম দেখার জন্য দোকানদার অন্য সবার সামনেই সেই জিনিসগুলো তুলে ধরে।”

কিছু দোকানদার খালি বিক্রি করেই সন্তুষ্ট হয় না। “এই জামাটা আপনাকে খুব সুন্দর লাগবে,” “এই লিপস্টিকটা আপনাকে বেশ মানাবে” এ রকম অযাচিত অনেক মন্তব্য করে।

শুধু নারীদের জন্য নির্দিষ্ট মার্কেটগুলোতে নারীরা এমন স্বাধীনতা পাবে, যা মিশ্র মার্কেটে নেই। এখানে তারা শুধুই নারী কর্মীদের দেখা পাবে। বিক্রেতা থেকে ব্যবস্থাপক সকলেই নারী। নারীদের নিজস্ব বিষয়াদি, যেমন অন্তর্বাস, স্যানিটারি ন্যাপকিন, কোনো বিব্রত বোধ করা ছাড়াই তারা কিনতে পারবে। অসাধু দোকানদাররা এখানে তার শালীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। পোশাকের রং পছন্দ করা, মাপ দেওয়া ইত্যাদিও খুব সহজেই করতে পারবে।

বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়ানোর উপায়

নারীরা নানা রকম পদ্ধতি ব্যবহার করেন বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়াতে। এক নারী জানান, "আমি কিনব না এ রকম একটা জিনিসের কথা বলে দোকানদারকে অন্য দিকে পাঠিয়ে দিই। তারপর আমার দরকারি অন্তর্বাস আমার ব্যাগে ভরে নিই। সে ফিরে এলে আমি রেজিস্টারে গিয়ে যা কিনেছি, তার দাম পরিশোধ করে দিই।"

এক ক্রেতা জানান, "নারীরা যাতে বিব্রত না হয়, তাই আমি তাদের দরকারি জিনিসের কাছে তাদের রেখে অন্য দিকে চলে আসি। তারা ব্যাগে ভরে সেসব জিনিস রেজিস্টারে নিয়ে আসার পর আমি সব খুলে খুলে দেখার বদলে কেবল প্রাইস ট্যাগ দেখে নিই।"

থাইল্যান্ড, আবুধাবি ও সৌদি আরবে নারীদের জন্য আলাদা মার্কেট অহরহ দেখা যায়। এমনকি তেল আবিবেও এমন মার্কেট আছে, যেখানে নারীদের সাথে দশ বছরের বেশি বয়সী কোনো বালককেও ঢুকতে দেওয়া হয় না। ইয়াহুদী নারীরা এই স্বাধীনতা পেয়ে খুশি। তাহলে আমরা কেন তা প্রয়োগ করব না?[১৪৩]

নারী পুলিশ বাহিনী

এমনকি নারীদের জন্য আলাদা মার্কেটেও মহিলা পুলিশ বাহিনী থাকা প্রয়োজন। কারণ, অনেক নারীই শরয়ী পর্দা না করে মার্কেটে আসতে পারে বা ক্যামেরা ফোন ইত্যাদির অপব্যবহার করতে পারে। তাই হারাম কাজে প্রতিরোধের জন্য পুলিশ বাহিনী থাকতে হবে।

এখানেও অবশ্যই ইসলামী শরিয়তের নিয়ম মেনেই চলতে হবে। নয়তো নারীদের আলাদা এসব দোকানও অনেক ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এসব দোকানের আশপাশে থাকা অন্য দোকানগুলোর জন্য এসব মার্কেট নারীদের সাথে দেখা করার জায়গায় পরিণত হয়েছে। কিছু মার্কেটে এমন নোংরা সব বিজ্ঞাপনের ছবি ব্যবহৃত হয়, যা নারীদের শালীনতা ধ্বংস করে দেয়। অনেকে মুখে মেকাপের মেকি নেকাব লাগিয়ে মার্কেটে যায়। অতএব, অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করতে হবে এবং তাঁর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে।

---

[১৪৩] http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_4926000/4926322.stm)

এসব মার্কেটের জন্য অনুসরণীয় কিছু বিধান :

১) দ্বীনদার নারীরা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবেন।

২) ক্যামেরা ও স্মার্টফোনের অপব্যবহার নজরদারিতে রাখতে হবে।

৩) মার্কেটের বাইরে যথাযথ পুলিশি নিরাপত্তা থাকবে, যাতে দুষ্ট লোকেরা কাছে ভিড়তে না পারে।

সালাফগণ যেভাবে বাজারে চলাফেরা করতেন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের জানিয়েছেন যে, রাসূল ﷺ ও অন্যান্য নবীগণ হাট-বাজারে যেতেন।

> **"তারা বলে, এ কেমন রাসূল, যে খাবার খায় আর হাট-বাজারে চলাফেরা করে? তার কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় না কেন, যে তার সঙ্গে সর্বদা থাকত সতর্ককারী হয়ে?"**[১৪৪]

> **"আমি তোমার পূর্বে যে সকল রাসূল পাঠিয়েছিলাম, তারা সবাই খাদ্য গ্রহণ করত আর হাট-বাজারে চলাফেরা করত।"**[১৪৫]

আল্লাহ তা'আলা সে সকল নেককার লোকের কথাও বলেছেন যারা হাটে-বাজারে বিক্রি-ব্যবসা করে, কিন্তু আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয় না।

> **"ওই সব লোকের দ্বারা ব্যবসায় ও ক্রয়-বিক্রয় যাদের তাঁর স্মরণ হতে বিচ্যুত করতে পারে না, আর সালাত প্রতিষ্ঠা ও যাকাত প্রদান থেকেও না। তারা ভয় করে কেবল সেদিনের, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উলটে যাবে।"**[১৪৬]

সালিম ইবনু আব্দুল্লাহ ﵀ বাজারে একদল লোককে দেখলেন, যারা একটু পর সালাতের জন্য উঠে গেল। তিনি তা দেখে বললেন, "এ রকম লোকদের ব্যাপারেই আল্লাহ কুরআনে বলেছেন 'ব্যবসায় ও ক্রয়-বিক্রয় যাদের তাঁর স্মরণ হতে বিচ্যুত করতে পারে না।'"[১৪৭]

---

[১৪৪] সূরাহ আল-ফুরকান, ২৫ : ৭

[১৪৫] সূরাহ আল-ফুরকান, ২৫ : ২০

[১৪৬] সূরাহ আন-নূর, ২৪ : ৩৭

[১৪৭] তাফসির আত-তাবারি : ১৯/১৯২

আবুদ্দারদা ﷺ বলেছেন, “মুসলিমের জন্য শ্রেষ্ঠ নির্জনবাসের স্থান হলো তার ঘর, যেখানে সে তার দৃষ্টি ও আব্রুর হেফাজত করতে পারে। বাজারের ব্যাপারে সাবধান! কারণ, এগুলো মানুষকে অসার কাজকর্মে ব্যস্ত হতে ও গাফেল হতে সাহায্য করে।” [১৪৮]

উক্ত আয়াতের ব্যাপারে ইব্রাহীম নাখাঈ ﷺ বলেন, “এরা বাজারের সেসব লোক, সালাতের সময় হয়ে গেলে যাদের কিছুই আটকে রাখতে পারে না।”[১৪৯]

ইমাম আহমাদ ﷺ-এর ছেলে আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, “আমার বাবা নির্জনতা অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ছিলেন সবচেয়ে ধৈর্যশীল। মাসজিদ, জানাযা কিংবা অসুস্থকে দেখতে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো সময় কেউ তাঁর দেখা পেত না। তিনি বাজারে ঘুরে বেড়ানোকে ঘৃণা করতেন।”[১৫০]

ইবনু আবু হুসাইল ﷺ বলেন, “আল্লাহ ভালোবাসেন যে, তাঁকে বাজারে স্মরণ করা হবে। কারণ, সেখানে হট্টগোল আর উদাসীনতা বেশি। আমি আল্লাহ তা’আলাকে স্মরণ করার একক উদ্দেশ্য নিয়েই বাজারে যাই।”[১৫১]

আত-তুফাইল ইবনু উবাই ইবনু কাব ﷺ সকাল বেলা আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ-এর সাথে বাজারে যেতেন। তিনি বলেন, “আব্দুল্লাহ ইবনে উমার যার সামনে দিয়েই যেতেন–হোক সে বড় বিক্রেতা বা ছোট বিক্রেতা, গরিব বা ধনী–সকলকেই তিনি সালাম দিতেন। একদিন সকালে আমি তাঁর কাছে যাওয়ার পর তিনি আমাকে বললেন, ‘বাজারে চলো।’ আমি বললাম, ‘আপনি তো বাজারে গিয়ে কিছু কেনেনও না, কোনো দামাদামিও করেন না, কিছু বেচেনও না, কোনো মজলিসে কথা বলার জন্য বসেনও না। তাহলে যাওয়ার দরকার কী? আমরা বরং এখানে বসেই কথা বলি।’ তিনি বললেন, ‘ওহে পেটওয়ালা, আমরা সেখানে যাই যাদের সাথে দেখা হয় তাদের সালাম দেওয়ার উদ্দেশ্যে।”[১৫২]

আবু আমরা আন-নাদাবি ﷺ বলেন, “আমি ইবনু উমারের সাথে বাজারে যেতাম। ছোট-বড় যার সাথেই দেখা হতো, তাকেই তিনি সালাম দিতেন। একবার এক

---

[১৪৮] বায়হাকি, শুয়াবুল ঈমান : ৭/৩৭৯; হান্নাদ ইবনুস সারি রচিত কিতাবুয যুহদ : ২/৫৮২

[১৪৯] বায়হাকি, শুয়াবুল ঈমান : ৩/৭৬

[১৫০] আবু নুয়াইমের কিতাব আল-হিলইয়া : ৯/১৮৪ এবং সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/৩৪৮।

১৫১ বায়হাকি, শুয়াবুল ঈমান : ১/৪১২

[১৫২] আল-বুখারি রচিত আল-আদাবুল মুফরাদ : ১/৩৪৮; আল-আলবানি একে সহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ : ১/৩৯৫ গ্রন্থে সহীহ বলেছেন।

অন্ধের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি তাকে সালাম দিলে সে জবাব দিলো না। তাঁকে জানানো হলো যে, লোকটি অন্ধ।"[১৫৩]

বর্ণিত আছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ বাজারের মাথায় দাঁড়িয়ে দু'আ করতেন, "হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে এর মধ্যকার কল্যাণ ও এর ভেতরে যা আছে সেসবের মধ্যকার কল্যাণ কামনা করি। এবং আমি আপনার কাছে এর অকল্যাণ ও এর ভেতর যা আছে সেসবের মধ্যকার অকল্যাণ থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই।"[১৫৪]

সালমান ﷺ বলেন, "বাজার এমন একটি ডিম্বাশয়, যেখানে শয়তান তার শুক্রাণু রেখে যায়। আপনি যদি সবার আগে প্রবেশ করে সবার শেষে বের না হওয়া ব্যক্তি হতে পারেন, তবে সেটাই করুন।"[১৫৫]

রাসূল ﷺ-এর সাহাবি মায়সাম ﷺ বলেন, "আমাকে বলা হয়েছে যে, মাসজিদে প্রথম যাওয়া ব্যক্তির কাছে ফেরেশতারা পতাকা নিয়ে যান। ব্যক্তিটি মাসজিদে থাকা পর্যন্ত ফেরেশতারা তার সাথে থাকেন এবং তার সাথে ঘরে ঢোকেন। আবার বাজারে প্রথম যাওয়া ব্যক্তির কাছে শয়তান তার পতাকা নিয়ে যায়। সে ঘরে ফেরার আগ পর্যন্ত শয়তান তার সাথে থাকে এবং পতাকা নিয়ে তার ঘরে প্রবেশ করে।"[১৫৬]

আল-হাসান ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি বাজারে গিয়ে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করল, সে সেখানকার সকল ফাসীহ ও আজামি পণ্যের মূল্য পেয়ে গেল।" আল-মুবারাক ﷺ বলেন, "ফাসীহ অর্থ মানুষ, আজামি অর্থ প্রাণীসম্পদ।"[১৫৭]

হুমাইদ ইবনু হিলাল ﷺ বলেন, "বাজারে গিয়ে আল্লাহর স্মরণ করা ব্যক্তির উপমা হলো মৃত উদ্ভিদরাজির মধ্যে একটি সতেজ উদ্ভিদের মতো।"[১৫৮]

---

[১৫৩] আব্দুর রাযযাক : ১০/৩৮৬

[১৫৪] আত-তাবারানির *আল-মুজামুল কাবির* : ৯/১৮১; আল-হাইসামি ﷺ বলেছেন, "এর বর্ণনাকারীরা সহীহাইনের বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। আর হানযালাও বিশ্বস্ত। *মাজমাউয যাওয়াইদ* : ১০/৮৯

[১৫৫] ইবনু আবী শাইবাহ : ৮/১৮১

[১৫৬] আবু আসিম রচিত *আল-আহাদুল মাসানি* : ৫/১৮৩; *সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব* : ১/১০১ গ্রন্থে আল-আলবানি ﷺ একে সহীহ বলেছেন।

[১৫৭] বায়হাকির *আশ-শুয়াব* : ১/৪১২) আস-সাওরি ﷺ বলেন, "মানসুর তাঁর এলাকার এক বৃদ্ধ লোককে বলতেন, "আপনার কি বাজারে যাওয়ার দরকার আছে? আপনার কি কিছু লাগবে? কারণ, আমি বাজারে যেতে চাই।" (*শুয়াবুল ঈমান* : ৬/১২৮)

মূসা ইবনুল মুগীরাহ ﵀ বলেন, “আমি দিনের মধ্যভাগে ইবনু সীরিনকে দেখেছি ‘আল্লাহু আকবার’ ‘সুবহানাল্লাহ’ বলতে বলতে ও আল্লাহর যিকির করতে করতে বাজারে প্রবেশ করতে। একজন দেখে জিজ্ঞেস করল, ‘হে আবু বকর, এই সময়ে আবার কিসের যিকির?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘হ্যাঁ, কারণ এটা এমন সময় যখন মানুষ যিকির থেকে উদাসীন থাকে।’”[১৫৯]

মালিক ইবনু দীনার ﵀ বলতেন, “বাজার সম্পদ বাড়াতে থাকে আর দ্বীন কমাতে থাকে।”[১৬০]

ইবনু আবু আদি ﵀ বলেন, “দাঊদ ইবনু আবি হিন্দ আমাদের কাছে এসে বললেন, ‘হে যুবক, আমি তোমাদের এমন কিছু বলব, যা থেকে হয়তো তোমরা কিছু উপকৃত হতে পারো। ছোট থাকতে আমি বাজারে যেতাম। তারপর ঘরে ফেরার সময় অমুক জায়গা পর্যন্ত আল্লাহর তা’আলার যিকির করতাম, তারপর আবার অমুক জায়গা পর্যন্ত, এভাবে করতে করতে বাসায় পৌঁছে যেতাম।”[১৬১]

ইবনু শাওযাব ﵀ বলেন, “বাজারে ফল বিক্রেতার কাছে আমি আল-হাজ্জাজ ইবনু ফারাসিফাহকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনি এখানে কী করছেন?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘আমি সে সকল ফলের দিকে তাকিয়ে আছি যাদের মৌসুম সীমিত এবং যার সরবরাহ এক সময় ফুরিয়ে যাবে।”[১৬২]

জারীর ﵀ বলেন, “আবু হাযিম কোনো ফলের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় তা খাওয়ার ইচ্ছা জাগলে বলতেন, ‘আমাদের দেখা হবে জান্নাতে।’”[১৬৩]

আব্দুল্লাহ ইবনু বাশির ﵀ বলেন, “তাউস আল-ইয়ামানি মাসজিদে আসা-যাওয়ার দুটি পথ নির্ধারিত রেখেছিলেন। একটা পথ ছিল বাজারের ভেতর দিয়ে আরেকটা অন্য দিক দিয়ে। একদিন এক এক পথ দিয়ে যেতেন। যেদিন তিনি বাজারের পথ দিয়ে যেতেন, সেদিন ভেড়ার মাথা ভাজি করা অবস্থায় দেখতেন। সে রাতে তিনি ঘুমোতে পারতেন না।”[১৬৪]

---

[১৫৮] আল-হিলইয়াহ : ২/২৫২
[১৫৯] হিলইয়াতুল আউলিয়া : ২/২৭২
[১৬০] হিলইয়াতুল আউলিয়া : ২/৩৮৫
[১৬১] হিলইয়াতুল আউলিয়া : ৩/৯৩
[১৬২] হিলইয়াতুল আউলিয়া : ৩/১০৮
[১৬৩] হিলইয়াতুল আউলিয়া : ৩/২৪৬
[১৬৪] হিলইয়াতুল আউলিয়া : ৪/৪

ইসহাক ইবনু খালাফ ﷺ বলেন, “আমর ইবনু কাইস আল-মালায়ি বাজারের ভেতরের লোকদের দেখে কেঁদে উঠতেন এবং বলতেন, ‘আখিরাতে যা তাদের জন্য প্রস্তুত করা আছে, তার ব্যাপারে এসব লোক কতই-না গাফেল ও উদাসীন!’”[১৬৫]

সালাফগণ দান-সদকার উদ্দেশ্যে ব্যবসা করতেন

শাকীক ইবনু আবু মাসউদ আল-আনসারি ﷺ বলেন, “আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের দান-সদকা করার আদেশ দিতেন। ফলে আমাদের একেকজন এক মুদ্দ (পরিমাপের একটি একক) আয় করার জন্য লেগে যেতাম যাতে তা দান করতে পারি। অথচ আজ আমাদের একেকজনের কাছে এক শ হাজার মুদ্দ থাকে।” তিনি যেন পরোক্ষভাবে নিজেকেই ইঙ্গিত করলেন।[১৬৬]

তিনি ﷺ আরও বলেন, “রাসূল ﷺ আমাদের দান করার আদেশ করতেন, কিন্তু আমাদের কাছে দেওয়ার মতো কিছুই থাকত না। তাই একেকজন পিঠে মালামাল বহন করে বাজারে নিয়ে বিক্রি করে এক মুদ্দ পরিমাণ কামাই করে সেটিই এসে দান করতাম। আমি এমন একজন মানুষকে চিনি যার কাছে এখন এক শ হাজার আছে, অথচ সেই সময়ে এক দিরহামও ছিল না।”[১৬৭]

তিনি বোঝাচ্ছেন যে, রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় সম্পদের কত অভাব ছিল, আর এখন অনেক অঞ্চল বিজয় করে সম্পদের পরিমাণ কত বেড়ে গেছে। এ ছাড়া আগেকার সময় প্রত্যেকের অল্প যা কিছু ছিল, সেখান থেকেই তাঁরা দান করতেন। অথচ পরবর্তীকালের মানুষেরা ঠিক তার বিপরীত হয়ে গেছে।[১৬৮]

---

[১৬৫] হিলইয়াতুল আউলিয়া : ৫/১০২

[১৬৬] *বুখারি* : ৪৩৯২

[১৬৭] নাসাঈ : ২৫২৮; আল-আলবানি একে *সহীহুন নাসাঈ* : ৬/১৭৩ গ্রন্থে সহীহ বলেছেন।

[১৬৮] ফাতহুল বারি : ৩/২৮৪

বাজারে হিসবাহ (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ)

মুহতাসিব হলো সেই ব্যক্তি, যাকে ইসলামী শাসক বা তাঁর প্রতিনিধির পক্ষ থেকে নিযুক্ত করা হয়। জনগণের অবস্থা, সুবিধা-অসুবিধা, বাজারের লেনদেন দেখাশোনা করা, প্রতারক-ঠগবাজদের উপর নজরদারি করা ও সে অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া মুহতাসিবের কাজ।[১৬৯] জাহিলি আরবের উকায বাজারেও একজন বিচারক নিযুক্ত থাকত, যাকে তারা 'বাজারের বিচারক' বলত। তার কাজ ছিল সেখানে হওয়া বাদ-বিবাদের নিষ্পত্তি করা।

> ইবনু কাইয়্যিম ﵀ বলেন, "সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির দায়িত্ব হলো জনগণকে জুমুয়ার সালাত আদায়, জামাতের সাথে সালাত আদায়, কথা ও কাজে বিশ্বস্ততা, সততা ও বিশুদ্ধতা ঠিক রাখার হুকুম করা। এ ছাড়া সে বিশ্বাসঘাতকতা, মাপে কম দেওয়া, উৎপাদন ও বিক্রয়ে প্রতারণা রোধ করবে। ওজন করার পাল্লা ও পণ্যের উৎপাদন তার দেখাশোনা করতে হবে।"[১৭০]

আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার শস্যের একটি স্তূপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় স্তূপের ভেতরে হাত প্রবেশ করালেন। তাঁর হাত ভিজে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ওহে শস্যওয়ালা, এটা কী?" সে জবাব দিলো, "বৃষ্টিতে ভিজে গেছে।" তিনি ﷺ বললেন, "তোমার সেগুলো স্তূপের উপরের দিকে রাখা উচিত, যাতে ক্রেতারা তা দেখতে পায়। যে প্রতারণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয়।"[১৭১]

ইবনু উমার ﵄ বলেন, "আমি দেখেছি রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় মানুষ এলোমেলোভাবে জিনিস ক্রয় করত (ওজন না করেই)। নিজেদের ঘরে নেওয়ার আগেই তারা সেগুলো বিক্রি করার চেষ্টা করলে তাদের (প্রহারের মাধ্যমে) শাস্তি প্রদান করা হতো।"[১৭২]

---

[১৬৯] আল-মাওসুয়াতুল ফিকহিয়্যাহ : ২/৯৭০

[১৭০] আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ : ৩৪৯-৩৫০ পৃ.

[১৭১] *মুসলিম* : ১০২

[১৭২] *বুখারি* : ২০৩০; *মুসলিম* : ১৫২৭

ইবনু হাজার ﷺ বলেন, "এ থেকে শিক্ষা হলো, যারা ইসলামী হুকুমের বিরুদ্ধে যায়, তাদের শাস্তি প্রদান করা জায়েয। দুর্নীতিপূর্ণ লেনদেনের শাস্তিবিধান করা হবে প্রহারের মাধ্যমে। এ থেকে আরও বোঝা যায় যে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ফরয দায়িত্ব পালনের জন্য কাউকে নিয়োগ করা জায়েয। এখানে যে প্রহারের কথা বলা হলো তা তাদের ক্ষেত্রে, যারা বিধান জানার পরও অমান্য করে।"[১৭৩]

নবীজি ﷺ মক্কা বিজয়ের পর সাঈদ ইবনু সাঈদ ইবনুল আস ﷺ-কে মক্কার বাজার তদারকের কাজে ব্যবহার করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উতবাহ ইবনু মাসউদ ﷺ-এর সাথে আস-সাইব ইবনু ইয়াযীদ ﷺ উমার বিন খাত্তাব ﷺ-এর সময় মদীনার বাজার তদারকের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

যাজান ﷺ বলেন, "আলী ﷺ বাজারে গিয়ে সালাম দিয়ে বলতেন, 'হে ব্যবসায়ীগণ, লেনদেনে অতিরিক্ত কসম করা থেকে বিরত থাকো। এতে পণ্য খরচ হয়ে যায় ও বারাকাহ দূর হয়ে যায়।'"[১৭৪]

মায়মুন ইবনু মাহরান ﷺ বলেন, "মদীনায় জুমুয়ার দিন মুয়াযযিন যখন জুমুয়ার আযান দিতেন, তখন তাঁরা বাজারে গিয়ে ঘোষণা করতেন, 'এখন বেচাকেনা হারাম। এখন বেচাকেনা হারাম।'"[১৭৫]

ইবনুল হাজ্জ ﷺ তাঁর কিতাব *আল-মাদখালে* তাঁর শিক্ষক আবু মুহাম্মাদ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি মাগরিবের সময় বাজারে এক মুহতাসিবের দেখা পান। তিনি প্রতিটা দোকানের মালিকের কাছে গিয়ে বিক্রয়ের বিধান, কীভাবে পণ্যে সুদ মিশে যেতে পারে, কীভাবে তা রোধ করা যায় এ সকল বিধান জিজ্ঞেস করতেন। যারা উত্তর দিতে পারত, তাদের দোকান থাকত। যারা পারত না, তাদের দোকান তুলে ফেলা হতো। তিনি বলতেন, "মুসলিমদের বাজারে আমরা এমন কাউকে থাকতে দিতে পারি না, যে সুদ বা অন্যান্য হারাম জিনিস নিয়ে আসবে।"[১৭৬]

ইয়াহইয়া ইবনু উমার ﷺ একই রকম একটি কাহিনি এনেছেন তাঁর বই *আহকামুস সুক*-এ। তিনি লেখেন,

---

[১৭৩] ফাতহুল বারি : ১২/১৭৯
[১৭৪] ইবনু আবী শাইবাহ : ৫/২৬০
[১৭৫] ইবনু আবী শাইবাহ : ২/৪৩
[১৭৬] *আল-মাদখাল* : ১/২২৮

> “যে শাসক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সে যেন তার শাসনাধীনের বাজারগুলোর দিকে খেয়াল রাখে। সবচেয়ে দ্বীনদার হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিটিকে যেন দোকানপাট ও মাপের পাল্লা তদারকের দায়িত্বে রাখা হয়। যদি এমন কোনো অপরাধী পাওয়া যায়, তাহলে তার অপরাধের মাত্রার ভিত্তিতে শাস্তি প্রদান করা হবে। তারপর তাকে দোকান থেকে তুলে দিতে হবে যতক্ষণ না তার মাঝে বিশুদ্ধ তাওবাহ দেখা যায়। শাসক এ পদক্ষেপ নিলে তিনি গুনাহ থেকে মাফ পেয়ে যাবেন এবং তাঁর শাসনাধীনেরা উত্তম হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তা’আলা।”[১৭৭]

সাজসজ্জাকারিণী নারীকে কি নাসীহাত করতে হবে?

সাধারণভাবে নারীকে নাসীহাত, আদেশ ও স্মরণিকা দেবে তার মাহরাম বা নারী আত্মীয়রা। কিন্তু সাজসজ্জা করে বের হওয়া নারীকে গায়রে মাহরাম মুহতাসিব নাসীহাত করতে পারবে কি না, এ ব্যাপারে আলিমগণ শিথিলতা দিয়েছেন যে, ফিতনার আশঙ্কা না থাকলে এ কাজ করা যাবে। কেউ নাসীহাত করলে অবশ্যই ইসলামী আদাব মেনে করতে হবে, যাতে ফিতনার আশঙ্কা দেখা না দেয়। অফিসিয়ালি হিসবাহর দায়িত্ব পালন করা ব্যক্তিরা এ কাজ করতে পারবে।

উপসংহার

যা কিছু বলা হলো, তা তাদের জন্যই যারা সচেতন হৃদয় ও মনোযোগী কান দিয়ে শোনে। আপনি যা পড়লেন, তার মাঝে যা কিছু ভালো, সত্য ও সঠিক বলে আপনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, তা অন্যদেরও জানিয়ে দিন যাতে আল্লাহ তা’আলার কাছে জবাব দিতে পারেন। এ ছাড়া এ বইয়ে যা কিছু ভুল, তা সংশোধন করে দিতে হবে কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফগণের পদ্ধতি অবলম্বনে।

আল্লাহ যেন আমাকে, আপনাকে ও প্রতিটি মুসলিম নরনারীকে তাকওয়া, সততা ও তাঁকে সন্তুষ্টকারী আমল করার তাওফিক দেন। আল্লাহ তা’আলা যেন আমাদের জীবনকে বরকতময় করেন, আমাদের ভুলভ্রান্তি ও সীমালঙ্ঘন ক্ষমা করেন। আল্লাহর কোনো নিয়ামাত আমাদের থেকে উঠে যাওয়া থেকে, স্বাস্থ্যহানি থেকে, আচমকা আযাব থেকে ও সব রকম গযব থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল ‘আলামীন। আস-সলাতু ওয়াস সালামু ‘আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া ‘আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহি আজমা’ঈন।

---

[১৭৭] আহকামুস সুক